সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৭৬-৭৮তম বর্ষ ॥ যুগ্ম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৭৬-৭৮তম বর্ষ ॥ যুগ্ম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৭৬-৭৮তম বর্ষ ॥ যুগ্ম সংখ্যা

॥ সূচীপত্র ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
বর্ষ ৭৬-৭৮ ॥ যুগ্ম সংখ্যা ঃ

রামকথার তন্ত্র

শ্রীসুকুমার সেন

॥ ১ ॥

রামকথার মূল সাহিত্যিক রচনা হল 'রামায়ণ'। সংস্কৃতে লেখা। আকারে মোটামুটি মহাভারতের সিকি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সমগ্র সাতকাণ্ড রামায়ণ মহাকাব্যটি এক সময়ের সুতরাং এক লেখকের লেখা নয়। আমাদের দেশের ঐতিহ্যে রামায়ণের রচয়িতার নাম বাল্মীকি। রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ড—বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিষ্কিন্ধ্যা ও যুদ্ধ (বা লঙ্কা)—আসলে একটি ব্যক্তির লেখা হতে পারে। এই ছয় কাণ্ডে রাম-কথা সম্পূর্ণতা পেয়েছে। সপ্তম (উত্তর) কাণ্ড যে পরবর্তী রচনা তা নামেই বোঝা যায়। এটি একটি স্বতন্ত্র কাহিনী, যার নায়ক রাম নন, তাঁর পুত্রদ্বয় ও তাঁদের পালক পিতা বাল্মীকি।

বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়াও রাম-কথা মিলেছে সংস্কৃতে, পালিতে, প্রাকৃতে, বিবিধ ভারতীয় দেশী ভাষায়, অভারতীয় মিলেছে—ইরাণী ভাষায়, তিব্বতী ভাষায়, শ্যাম-কাম্বোজ-দ্বীপময় ভারতের বিভিন্ন ভাষায়। এই সব রাম-কথার সর্বত্র রামায়ণের অনুসরণ নেই। অনেকগুলির মূল সূত্র এসেছিল অন্য ঐতিহ্য থেকে। এবং এসবের কোন কোনটির রামায়ণের প্রভাব কমবেশি পাওয়া যায়। এইসব রাম-কথার আলোচনা 'রাম-কথার প্রাক্-ইতিহাস' পুস্তিকাটিতে পাওয়া যাবে। উপস্থিত প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করছি যে রাম-কথা কোন একটি কবির মানসকল্পনাজাত অথবা কোন দেশের ঐতিহ্যসম্ভূত আখ্যানাবলী নয়। কোন অবতারের পুরাণপ্রসিদ্ধ জীবনচরিতও নয়। এ আখ্যানাবলীর মূল বীজ ছিল অনেকগুলি উড়ো লৌকিক গল্প, যে বীজ যথেষ্ট মিলেছে স্বদেশে ও বিদেশে। এই উড়ো বীজ থেকে কেমন করে যে বিভিন্ন রাম-কথাগুলি অঙ্কুরিত ও প্রবর্ধিত হয়েছিল তাহাই আলোচনা করে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। এই উড়ো বীজ থেকে একটি বনস্পতি উদ্গত হয়েছিল—রামায়ণ মহাকাব্য। কিন্তু বিভিন্ন রাম-কথাগুলি সবই রামায়ণ-মহাকাব্যের বীজ-জাত নয়, আওতায় জাত, কোন কোনটি কলম-জাত।

॥ ২ ॥

সাতকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে তিনটি 'কথা' আছে। প্রথম কথা রামের নির্বাসন ও বনবাস। দ্বিতীয় কথা বনবাসী রামের পত্নী-হরণ ও পত্নী-উদ্ধার। তৃতীয় কথা পত্নীহারা রামের পুত্রপ্রাপ্তি। এই তিনটি কথা একদা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। আগে প্রথম কথা দুটির মধ্যে যোগসূত্র কল্পনা করে আসল অর্থাৎ ছয়-কাণ্ড রামায়ণ রচিত হয়। তার অনেক কাল পরে

তৃতীয় কথাটি মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে যায়। পূর্বগামী পণ্ডিতদের এই যে ধারণা এর কিছু নূতন প্রমাণ আছে।

প্রধান এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল প্রথম ও দ্বিতীয় কথা দুটি প্রাচীন সাহিত্যে মিলেছে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাম-আখ্যানরূপে। অন্যত্র ('রাম-কথার প্রাক্ ইতিহাস' পুস্তিকায়) দেখিয়েছি যে প্রথম কথাটি সম্পূর্ণ রাম-কথারূপে মিলেছে বৌদ্ধ সাহিত্যে পালিতে (জাতক ৪৬১), মহাভারতে দুবার, (দ্রোণ পর্ব ৫৭ অধ্যায়, শান্তি পর্ব ২৯ অধ্যায়) এবং হরিবংশে (১.৪১)। এ আখ্যানে রাম সত্যসন্ধ মহাপুরুষ, পণ্ডিত বিচক্ষণ দানশীল সুশাসক রাজা। তিনি পিতার প্রদত্ত বনবাসদণ্ড স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং দণ্ডকাল শেষ হবার পরে দেশে ফিরে গিয়ে রাজা হয়েছিলেন। এই কথায় তিনটি স্তর পাওয়া যায়। একটি স্তরে সীতার ও ভাইদের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় স্তরে সীতা ভগিনী। তৃতীয় স্তরে সীতা পত্নী। শেষ দুই স্তরেই ভাইদের উল্লেখ পাই।

এই কথার গল্পটির একটি স্বতন্ত্র প্রাচীনতর (?) রূপও ছিল। সে গল্পে বনবাস-প্রত্যাগমন ছিল না, ছিল বিসর্জন ও পুনরাগমন। সে কাহিনী উড়ো বীজেই রয়ে গেছে, অংকুরিত হতে পারে নি। উড়ো বীজের প্রসঙ্গে তা বলব।

॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় কথায় (অর্থাৎ স্বাধীন কাহিনীটিতে) রাম (অথবা অনামা তরুণ রাজা) রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে (অথবা মৃগয়া উপলক্ষ্যে) অরণ্যবাসে ছিলেন। সঙ্গে তার পত্নী ছিল (অথবা অরণ্যবাস কালে পত্নী সংগ্রহ করেছিলেন)। এই পত্নীকে হরণ করে এক মায়াবী তপস্বী (অথবা তপস্বী বেশ ধরে মায়াবী রাক্ষস)। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বানরদলের সঙ্গে মিত্রতা করে তাদের সাহায্যে রাম পত্নীকে উদ্ধার করেন। তারপর পত্নীসহ (অথবা পত্নীছাড়া) দেশে ফিরে গিয়ে রাজপাটে বসেন। এ আখ্যানটি মিলেছে একটি বৌদ্ধ জাতকে, চীনা অনুবাদে, (২৫১ খ্রীষ্টাব্দে করা), মহাভারতে বনপর্বে (অধ্যায় ২৭৪ শ্লোক ১-৩) আর খোটানি ভাষায় রামচরিত বর্ণনায় (গদ্যে ; আনুমানিক নবম শতাব্দী)। মহাভারতের কাহিনীটি খুব সংক্ষেপে। অন্যত্র বলা হয়নি বলে এখানে উদ্ধৃত করছি। জয়দ্রথের হাতে দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও উদ্ধারের পর যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মার্কণ্ডেয় এই গল্পটি বলেছিলেন ঃ—

> প্রাপ্তম্ অপ্রতিমং দুঃখং রামেণ ভরতর্ষভ।
> রক্ষসা জানকী তস্য হৃতা ভার্যা বলীয়সা ॥১॥
> আশ্রমাদ্ রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
> মায়াম্ আস্থায় তরসা হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্ ॥২॥
> প্রত্যাজহার তাং রামঃ সুগ্রীববলম্ আশ্রিতঃ।
> বদ্ধা সেতুং সমুদ্রস্য দগ্ধা লঙ্কাং শিতৈঃ শরৈঃ ॥৩॥
> অর্থাৎ, 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুলনাহীন দুঃখ পেয়েছিলেন রাম।
> অধিকতর বলবান্ রাক্ষস কর্তৃক তাঁর ভার্যা জানকী অপহৃত হয়েছিল ॥১॥
> (জানকী অপহৃত হয়েছিলেন) তাঁদের আশ্রম থেকে রাক্ষসদের রাজা
> দুরাত্মা রাবণ কর্তৃক, প্রবল মায়া দেখিয়ে, শকুনি জটায়ুকে নিহত ক'রে ॥২॥

সুগ্রীবের সৈন্য সাহায্যে সমুদ্রে পুল বেঁধে তীক্ষ্ণ শর দিয়ে
লংকাকে পুড়িয়ে তাকে উদ্ধার করেছিলেন রাম' ॥৩॥

(তিনটি মাত্র শ্লোকে গল্পটি শোনবার পর যুধিষ্ঠির রাম-কথা বিস্তৃতভাবে শুনতে চাইলে মার্কণ্ডেয় তা বর্ণনা করলেন উনিশ অধ্যায়ে। এই উনিশটি অধ্যায়ের (২৭৪-২৯২) প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোক আগে উদ্ধৃত করেছি। এই তিনটি শ্লোক মাত্র আদি মহাভারতে ছিল। বিস্তৃত বর্ণনাতে দুটি কাহিনী জুড়ে গেছে। এ পরবর্তী কালের প্রসাধন। তবুও রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে সবটা মেলে না। এ প্রসংগ পরে আলোচনা করব।)

তৃতীয় শতাব্দীর চীনা অনুবাদে যে জাতক গল্পটি মিলেছে তাতে পাত্রপাত্রীর নাম নেই। তবুও যে এটি রাম-কথা তা কাহিনী অনুসারে স্বীকার করতে হয় এবং নায়ক যে মহাপুরুষ রাম তা তাঁর বোধিসত্ত্ব বলে উল্লেখ থেকেও বোঝা যায়। গল্পটি কিছু খণ্ডিত। উপক্রম অন্যরকম। মাতুল এসে রাজ্য কেড়ে নেওয়ায় নায়ক সপত্নীক অরণ্য আশ্রয় করেছিলেন। মাতুলের আক্রমণ কেকয়ীর বিরূপতারই এক বিকল্প বলে মনে হয়। হয়ত এখানে প্রথম কথার সঙ্গে কিছু যোগাযোগ ছিল। কিন্তু বর্ণণীয় বস্তুর সঙ্গে তার যোগসূত্র খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়। প্রতিনায়ক এখানে সমুদ্রবাসী নাগ—রাবণের আসল রূপ। সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে তবে পত্নীর মিলন হয় পতির সঙ্গে।

খোটানী রাম কথার[১] উপক্রম একেবারে অন্যরকম। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ জমদগ্নির গোরু চুরি করেছিলেন এই অপরাধে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম দশরথের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিহত করেন। দশরথের দুটি শিশু পুত্র ছিল। তাদের বাঁচাবার জন্যে রাজমহিষী তাদের ভুগর্ভে অজ্ঞাতবাস করান বারো বছর ধরে। তারপর রাম লক্ষ্মণ সমর্থ হয়ে পরশুরামের সন্ধানে বার হন। এক পাহাড়ে তার দেখা পেয়ে রাম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করেন এবং দেশে সর্বেসর্বা হন।

দুই ভাই একদা বনে বেড়াতে যান। সেখানে এক ঋষির পালিত কন্যাকে দেখেন। এ কন্যা ছিল ব্রাহ্মণদের রাজা দশগ্রীবের (অর্থাৎ রাবণের) অলক্ষণা সুতরাং পরিত্যক্ত কন্যা। এই কন্যাকে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ বনের অন্যত্র গিয়ে বাস করতে থাকেন। দশগ্রীব একদিন আকাশে উড়ে যেতে যেতে মেয়েটিকে দেখে এবং নিজের মেয়ে না জেনে তার রূপে মুগ্ধ হয়। সে নেমে আসে। সীতার প্রহরী ছিল এক শকুনি। সীতা নিজে ছিল মন্ত্রের বেড়ার মধ্যে। দশগ্রীব শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। তার পর ভিখারী ব্রাহ্মণ সেজে ভিক্ষা গ্রহণ করবার ছলে সীতাকে ধরে নিয়ে লঙ্কাদ্বীপে চলে যায়। দুভাই সীতার খোঁজ করতে থাকে বারো বছর ধরে। শেষে তারা দেখা পায়, বানররাজ দুভাই নণ্ড ও সুগ্রীবের সঙ্গে। দুজনে একই রকম দেখতে এবং দুজন যুদ্ধ করছে। রাম নণ্ডর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সুগ্রীবকে গোপনে—তারা যখন যুদ্ধ করছে সেই অবস্থায়—হত্যা করেন। তারপর নণ্ড রামকে সাহায্য করে সীতার অন্বেষণ ব্যাপারে। এক পাখীর মুখ থেকে জানা গেল যে সীতা আছেন লংকা দ্বীপে। তখন বানররা সমুদ্রে পুল বাঁধলে। বানরসৈন্য নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ লংকায় গেলেন। দশগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। দশগ্রীব বিষাক্ত বাণ মেরে রামকে মৃতকল্প করে দিলে। চিকিৎসক জীবক রামকে বাঁচিয়ে তুললে

১। স্যার হ্যারল্ড বেইলি (Sir Harold W. Bailey কর্তৃক আবিষ্কৃত, প্রকাশিত এবং অনুদিত)।

'মৃত-সঞ্জীব' ঔষধ দিয়ে। এ ঔষধ নন্ড এনে দিলে হিমালয় থেকে। গাছটি সে চিনতে পারেনি বলে গোটা পাহাড়টাই তুলে এনেছিল। তারপর আবার যুদ্ধ চলল। জ্যোতিষীরা রামকে বলে দিলে দশগ্রীবের মর্মস্থান পায়ের বুড়ো আঙুলে আঘাত না করলে তাকে ঘায়েল করা যাবে না। তখন রাম দশগ্রীবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে তাকে তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দেখালে চ্যালেঞ্জ করলেন। দশগ্রীব তা দেখাতেই রাম সে আঙুল তীরবিদ্ধ করলেন। দশগ্রীব হার মানলে। রামের আনুগত্য স্বীকার করায় রাম তাকে প্রাণে মারলেন না।

সীতার সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণ লংকায় এক বছর যাপন করলেন। তারপর সীতাকে নিয়ে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে। লক্ষ্মণ চাইলেন টাকাকড়ি দিয়ে প্রজাদের মুখ বন্ধ করতে। সীতা তা চাইলেন না। তিনি পাতালে প্রবেশ করলেন। তারপর রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রের নাগদের তাড়িয়ে দিলেন ওষুধ ও সর্ষে পুড়িয়ে।

এই খোটানি গল্পটিতে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। প্রথমত পরশুরাম ও দশরথের সংঘর্ষ। এটির ক্ষীণ আভাস পড়েছে প্রচলিত রাম-কথায়ও। সীতাকে বিয়ে করে আসবার সময় পরশুরামের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ খোটানি গল্পে উল্লিখিত বিরোধেরই কিঞ্চিৎ তলানি মাত্র। আসলে কি পরশুরামই সীতার পালক পিতা, বাল্মীকির প্রথম সংস্করণ ?

দ্বিতীয়ত, খোটানি গল্পে রাম ও লক্ষ্মণ দুজনেই সীতার প্রণয়প্রার্থী। মনে হয় এই মোচড়টুকু পালি জাতকে উল্লিখিত ভাই-বোন সম্বন্ধেরই জের। জনকের সভা ধনুর্ভঙ্গ ইত্যাদির কোনই উল্লেখ নেই। তবে সীতা দশগ্রীবের কন্যা। রাবণ দশগ্রীব নামেই আগাগোড়া উল্লিখিত। এই নাম যেন দশরথ নামের জোড়া। রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে পেয়েছিলেন বনে, তপস্বীর আশ্রমে। এ গল্পে হনুমান নেই। হনুমান এক হয়ে গেছে রামায়ণ-কাহিনীর সুগ্রীবের সঙ্গে। আর সে কাহিনীর বালী হয়েছে সুগ্রীব এবং সে কাহিনীর সুগ্রীবের নাম হয়েছে নন্ড। দশগ্রীব মরে নি, মুনি হয়েছিল। সীতাকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল লঙ্কাতেই। সীতা-পুত্রের কোনই উল্লেখ নেই।

উপক্রম অংশ বাদে, পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় কাহিনীটি মিলেছে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের মারানাও ভাষায় লেখা (দ্বাদশ-চতুর্দশ শতাব্দী) 'মহারাদিয়া লাওয়ানা' (অর্থাৎ— মহারাজা রাবণ) কাব্যে। গল্পটিতে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে।

কোন এক দেশের রাজার ছেলে ছিল রাবণ। তার দশটা মাথা, তবে হাত দুটি মাত্র। সে ছিল দুর্বিনীত ও অত্যাচারী। সেই জন্যে পিতা তাকে লঙ্কা নগরে ('পুলু নগর') নির্বাসন দেন। সেখানে রাবণ তপস্যা করে ক্ষমতাপন্ন হয়, আর ফিরে এসে পিতৃরাজ্য অধিকার করে। অপর এক রাজ্যে রাজার দুছেলে ছিল। তাদের নাম রাজা মঙ্গন্দিরি ও রাজা মঙ্গবর্ণ। তাদের বয়স হয়েছিল কিন্তু বিয়ে হয়নি। সন্ধান পেয়ে দুভাই বিবাহের উদ্দেশ্যে এক দূর দেশে যাত্রা করে জল-পথে। এ দেশের নাম 'পুলু নাবানদাই', রাজকন্যার নাম তিহাইয়া। সেখানে পেঁছিতে রাজপুত্রদের দশ বছর লেগে গেল। সেখানে গিয়ে রাজা মঙ্গন্দিরি বিবাহার্থীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। দু ভাই সে দেশে কিছু কাল কাটিয়ে শেষে দেশের দিকে রওনা হলেন। এবারে ধরলেন তাঁরা স্থলপথ। সঙ্গে অনেক লোকজন। দীর্ঘ পথ ফুরোবার অনেক আগেই তাঁদের খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল। অগত্যা তাঁদের এক স্থানে উপনিবেশ করে চাষ আবাদের দ্বারা শস্য সঞ্চয় করবার জন্যে রয়ে যেতে হল। এখানে থাকতে থাকতে একদিন রাজকন্যা তিহাইয়া দেখলেন যে এক

সোনার-শিঙ হরিণ ক্ষেতে ঢুকে ফসল খাচ্ছে। দেখে তাঁর লোভ হয় হরিণটাকে পোষবার জন্যে। পত্নীর নির্বন্ধে মঙ্গন্দিরি ছুটলেন সে হরিণ ধরতে। কায়দা করতে না পেরে তিনি ভাইকে ডাক দিলেন তাঁর সাহায্যে আসতে। ভাই এলেন। তখন একটি হরিণ দুটি হয়ে দুদিকে ছুটে পালাল। ফলে দুভাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। মঙ্গন্দিরি যার পিছনে ছুটেছিলেন সে তাঁকে বাড়ির কাছে এনে দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। তিনি ঘরে ফিরে এসে দেখেন যে পত্নী নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, এ কাজ লাওয়ানার। (সম্ভবতঃ রাবণ তিহাইয়ার পাণিপ্রার্থী ছিল।)

মঙ্গন্দিরি তখন ভাইয়ের খোঁজে চললেন। পড়ে গেলেন তিনি এক নদীতে, হয়ে গেলেন অচৈতন্য। সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন যেন এক বুনো মোষ তাকে তাড়া করেছে, তাতে তাঁর অণ্ডকোষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বদিকে ছিটকে পড়েছে—পড়েছে একেবারে সে দেশের রানী লাঙ্গাবীর মুখের মধ্যে আর রাণীও তা গিলে ফেলেছে। তার ফলে লাঙ্গাবী এক ছোট্ট বানর শিশুর জন্ম দিলে। তার নাম রাখা হল লক্ষ্মণ। মঙ্গন্দিরি এই পর্যন্ত স্বপ্ন দেখেছেন এমন সময় মঙ্গবর্ণ এসে তাঁকে জল থেকে তুলে সুস্থ করলেন।

তিহাইয়ার খোঁজে দুভাই বেরোবেন বেরোবেন করছেন এমন সময় স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করে বানর শিশু লক্ষ্মণ তাদের কাছে এসে হাজির হল। লক্ষ্মণের সহায়তায় দুভাই জলের কুমীর বনের মোষ আর গাছের বানর জুটিয়ে নিয়ে এক বিরাট বাহিনী গঠন করলে। তারপর মঙ্গন্দিরির হাতের তেলো থেকে লাফ মেরে লক্ষ্মণ সাগর উত্তীর্ণ হয়ে তিহাইয়ার সন্ধান এনে দিলে। লক্ষ্মণ লক্ষ্য করেছিল যে যখনই লাওয়ানা তিহাইয়াকে ছুঁতে যায় তখনই দুজনের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে বাধার সৃষ্টি করে।

তার পর দু দলে যুদ্ধ বাধল। লাওয়ানার সৈন্য পরাস্ত হল। তখন সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামল। এক বিশেষ পাথরে শাণ দেওয়া তলোয়ারে—এ ব্যাপার লাওয়ানার মৃত্যুর তুক—লাওয়ানা পতিত হল। পরাজিত হয়ে লাওয়ানার মতিগতি বদলে গেল। সে ভালোভাবে নিজের রাজ্য শাসন করতে লাগল। ভাই, লক্ষ্মণ ও পত্নীকে নিয়ে মঙ্গন্দিরি তাঁর দলবল নিয়ে দেশে ফিরে এলেন কুমীরের পিঠে চেপে। দেশে ফিরে লক্ষ্মণের রূপ বদল ঘটল, সে সুরূপ রাজকুমারে ('দাতু') পরিবর্তিত হল। সকলে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

ফিলিপিন কাহিনীর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এ কাহিনীর কোন উপক্রম নেই, সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর। দ্বিতীয়ত, এতে পত্নী সংগ্রহ ঘরে থেকে নয়, বিদেশে গিয়ে। তৃতীয়ত, অপহরণে মৃগের সহায়তা। চতুর্থত, হনুমানের সঙ্গে রাম-সীতার সম্পর্কের এক অভিনব ব্যাখ্যা। (এ-ব্যাপারে দ্বীপময় ভারতের অন্য রাম-কথা কতক মেলে, তবে এতটা সুস্পষ্টভাবে নয়।) পঞ্চমত, জল-স্থল-আকাশচারী ত্রিশক্তি সমাবেশে উদ্ধার-বাহিনী গঠন। ষষ্ঠত, লক্ষ্মণকে হনুমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে দুই ভাইয়ের সঙ্গে রাজকুমারীর সম্পর্ক একটু যেন অস্পষ্ট রাখার চেষ্টা।

॥ ৪ ॥

তৃতীয় কথাটি হল, এক রাজার পত্নী পরিত্যাগের গল্প। অপবাদে দূষিত নির্দোষ পত্নীকে বনবাস দেওয়া হয়। সেখানে সে এক মুনির আশ্রমে থেকে সন্তান প্রসব করে। বনবাস দেবার সময়ে রাজা জানতেন না যে পত্নী সসত্ত্বা। মুনি ছেলেকে (বা যমজ ছেলেকে)

মানুষ করে তাদের গান শেখান। সেই গান শুনে রাজা খুশি হয়ে তাদের পরিচয় জানতে চান। পরিচয় পেয়ে তাদের পুত্র বলে গ্রহণ করেন। পতির সঙ্গে মিলনের আগেই পত্নীর দেহত্যাগ হয়।

এই কাহিনীটি উত্তরকাণ্ড রামায়ণের বিষয়। মূল রামায়ণে ছিল না। মহাভারত বনপর্বে যে বিস্তৃত রামোপাখ্যান আছে তাতেও নেই। ভট্টিকাব্যেও নেই।

॥ ৫ ॥

এইবার 'কথা' তিনটির দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়া উড়ো বীজের আলোচনা করি।

প্রথম কথার উড়োবীজ যে সব মিলেছে তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল পুরোনো আইরিশ মিথের একটি গল্প,—'লিরের পুত্রকন্যা' (Oidheadh Cloinne Lir)। দেশের প্রাচীনতম অধিবাসীদের রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন বোব। নির্বাচনে খুশি না হয়ে লির রাগ করে দূরে গিয়ে বাস করতে থাকেন। বোব বেশ ভালো রাজা ছিলেন। তাঁর তিনটি পালিত কন্যা ছিল। তিনি লিরকে নিমন্ত্রণ করে এনে বড়োমেয়ে ইভকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। দুজনে সদ্‌ভাবে সংসার করতে লাগলেন নিজের ঘরে। তাঁদের জন্মাল দুদফা যমজ সন্তান। প্রথমে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। এদের নাম হল ফিনোলা ও আব্রদ। তার পরে জন্মাল দুটি ছেলে। তাদের নাম হল ফিআক্রা ও কনুন্। কিছু দিন পরে লিরের পত্নীবিয়োগ হল। তখন শ্বশুর বোব তাঁর দ্বিতীয় কন্যা ইভাকে লিরের দ্বিতীয় পত্নী করেছিলেন। ছেলে মেয়ের মুখ চেয়ে লির আপত্তি করেন নি। কিছুদিন পরে ইভা লক্ষ্য করলে যে লির ছেলেমেয়েদের একটু বেশি মাত্রায় ভালোবাসেন। এই ভাবনার বশে তার মনে ঈর্ষা জন্মাল। সে ঈর্ষা শীঘ্রই হিংসায় পরিণত হল। সে ছেলে মেয়েদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় রইল। এক বছর সে পীড়ার ভাণ করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বোন-সতীনের সন্তানদের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে লাগল। একদিন সকালে ইভা ছেলে মেয়েদের নিয়ে রথে চড়ে বাপের বাড়ি যাবার উদ্যোগ করলে। ফিনোলা প্রথমে যেতে চায় নি, শেষে বাধ্য হয়েছিল। রথ টানা দক্ষিণ মুখে চলল। কিছুদূর এসে ইভা সঙ্গের লোকজনকে বলেছিল ছেলেমেয়েদের কেটে ফেলতে। তারা রাজি হয়নি। আবার রথ চলল, এসে পৌঁছল এক হ্রদের ধারে। সকলে রথ থেকে নামল। ইভা ছেলে মেয়েদের বললে, কাপড় চোপড় খুলে হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করতে। যেই তারা জলে নামল অমনি ইভা যাদু-দণ্ড ছুঁইয়ে একে একে তাদের সাদা রাজহাঁস করে দিলে। তারপর সে মন্ত্র পড়ে তাদের শাপ দিলে। সে শাপের ফলে তারা প্রায় অনন্ত কাল ধরে রাজহাঁস হয়ে থাকবে তবে মানুষের মত কথা কইতে পারবে।

ব্যাপার শুনে লির হায় হায় করতে থাকেন কিন্তু শাপ কাটাবার কোন উপায় খুঁজে পাননি। তিনি মাঝে মাঝে হ্রদের ধারে এসে হাঁসদের গান শুনতেন।

শাপ দেওয়া পর্যন্ত সৎমার ব্যাপারটির মিল রাম-কথার সঙ্গে স্পষ্ট। পালি জাতক গল্পের সঙ্গে মিল সীতা ও লক্ষ্মণের জলে নামায়। হাঁসেদের গানে মিল টেনেছে উত্তর কাণ্ডের সঙ্গে। পালি জাতকের সঙ্গে আরও মিল ভাই বোন ব্যাপারে।

এ কাহিনী পালি জাতকের তুলনায় আরো পুরোনো বলে মনে হয়। এতে নির্বাসিতদের পুনরাবর্তন নেই।

দ্বিতীয় কথার একটি বিশিষ্ট রূপান্তর পেয়েছি যবদ্বীপীয় এক লৌকিক গল্পে। এতে পুনরাবর্তন নেই, তবে হ্রাস হওয়াও নেই। গল্পটি Dr. Juan H. Francisco-র প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

একদা এক বুড়ো রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল অনেক স্ত্রী, অনেক সন্তান। বড়ো ছেলে, রাম রাজা (Jamojaja), দেবতার মতো সুন্দর শক্তিশালী ও উদার। প্রজারা তাঁর খুব অনুগত ছিল। রামরাজাকে দারুণ হিংসে করত তাঁর সৎমা দেবী অঞ্জনা (Devi Andana)। সে চাইত তাঁর নিজের ছেলে যাতে তাঁর স্বামীর সিংহাসনে বসতে পারে। রূপসী সে ছলাকলা বিস্তার করে স্বামীর মন ভুলিয়ে রামরাজাকে নির্বাসিত করবার প্রতিজ্ঞা আদায় করে নিলে। সেই দিনই সন্ধ্যে বেলায় রাজা বড়ো ছেলে ও সভাসদদের ডেকে বললেন, 'আমার বড়ো ছেলের কিছু শত্রু জুটেছে, তাকে মেরে ফেলতে চায়। আমি তাকে হুকুম করছি সে যেন আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। আমার মৃত্যুর পর সমীরণ (Samijan) রাজা হবে।' অগত্যা রামরাজা বনে চললেন। তাঁর পত্নী দেবী কুসুমো (Devi Kusumo) তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। যাবার আগে সৎমা গোপনে রামরাজাকে বিষ খাইয়ে দিলে। সে বিষের ফল দেরিতে ফলে।

অনেক দূর চলে যাবার পর তাঁরা পৌঁছলেন এক গভীর খাদের ধারে। সেখানে রামরাজা অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন এবং তাঁর মৃত্যু হল। পত্নী বিলাপ করতে লাগলেন। একটু পরে দেখলেন এক দেবতা—বিবাহের দেবতা কামরাজা। তিনি রামরাজাকে বাঁচিয়ে রাখলেন কিন্তু মানুষ আকারে নয়। রামরাজা পবিত্র গাছ হয়ে মাথা তুলে উঠলেন। পত্নী সে গাছ জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তার পর তিনি কাঁদতে কাঁদতে স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়ে গেলেন।

রামরাজা স্ত্রীকে নিয়ে বনে গেছে জানতে পেরে প্রজারা খুঁজতে বেরিয়েছিল কিন্তু কোন খোঁজ না পেয়ে তারা ফিরে গেল। সমীরণও তাদের সঙ্গে গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করে। সে কিন্তু ফিরল না। দেবতারা তাকে পাখী করে দিলেন। সে পাখী হয়ে ডেকে বেড়াতে লাগল "কাকাগালোত" "কাকাগালোত" (মানে, 'ভাইকে খুঁজছি', 'ভাইকে খুঁজছি')। সেই ডাক পাখী এখনও ডাকে। সে গাছ এখনো লোপ পায় নি। সে ঝরণা এখনো বইছে।[১]

এই গল্পের পরিণতি লক্ষ্য করবার মত। যেন রাম সীতা ভরত যথাক্রমে গাছ জল ও পাখি শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রচলিত রাম-কথায় এই তিন শক্তির প্রকাশ দেখি বানরে, সমুদ্রে ও জটায়ুতে।

একটি উড়োবীজ পাওয়া গেছে বাংলা গল্পে। তবে সোজাসুজি নয় সাঁওতালদের মারফৎ।[২] এক রাজার ছিল দুটিরাণী আর এক উপরাণী। বড়ো রাণীর দুটি ছেলে, সীত ও লক্ষ্মণ, ওদের রেখে তিনি মারা যান। সৎমা ছেলে দুটিকে দেখতে পারত না, কিন্তু উপরাণী তাদের খুব যত্ন করত। ছোট রাণী রাজাকে পরামর্শ দেয় ছেলে দুটোকে দূর করে দিতে। কিন্তু রাজার মত হয় না। শেষে রাণী কঠিন রোগের ভাণ করে বিছানা নিলে। রাজা তাকে খুব ভালোবাসত, তাই অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। তার পর রাণীর পরামর্শ মতো চিকিৎসক

১। Indonesian Fairly Tales, Adile dev Leeuw (1967) পৃষ্ঠা ৭৯-৮৮।

২। Folklore of Santal Paraganas, C. H. Bompas (1909) পৃষ্ঠা ২৩৭-২৪০।

রাজাকে জানালে যে রাণীকে বাঁচিয়ে রাখবার একমাত্র ওষুধ হল ছেলে দুটির মেটে অর্থাৎ যকৃৎ। বুদ্ধিভ্রষ্ট রাজা তাই হুকুম দিলে ছেলে দুটিকে বনে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলে তাদের মেটে এনে দিতে। সেপাইরা সীত-লক্ষ্মণকে বনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে দুটো কুকুর কেটে তাদের মেটে এনে দিলে। সৎমা তা খেয়ে অসুখের ভাণ ছেড়ে দিলে।

সীত-লক্ষ্মণ বনে বনে ঘুরতে লাগল। এক সময় হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল, একটা গাছের গুঁড়ি বেয়ে সাপ উঠছে উপর ডালে পাখির বাসার দিকে লক্ষ্য করে। তারা সাপটাকে মেরে ফেললে। বাসায় পাখীর বাচ্চা ছিল, তারা বেঁচে গেল। বাচ্চাদের বাপ মা এসে ব্যাপার শুনে খুশি হয়ে সীত-লক্ষ্মণকে তাদের খাবারের কিছু কিছু খেতে দিলে আর তাদের আশীর্বাদ করলে,—সীত রাজা হবে, লক্ষ্মণের মুখ থেকে সোনা খসবে।

তারপর একদিন সীতকে একস্থানে রেখে লক্ষ্মণ দূরে গেছে শিকার অন্বেষণে, এমন সময় সেখানকার রাজার পাট-হাতি ঘুরতে ঘুরতে এসে সীতকে দেখে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে রাজবাড়িতে চলে গেল। সেদিন সে রাজ্যের রাজকন্যার স্বয়ংবরের আয়োজন হয়েছে। পাট-হাতি এনে দেওয়াতে সীতেরই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল আর সীত রাজ্যের রাজা হল। লক্ষ্মণ এসব কিছুই জানতে পারলে না। ধাতস্থ হয়ে সীত লক্ষ্মণের খোঁজ করতে লোক পাঠালে কিন্তু তার কোন খোঁজ তখন পাওয়া গেল না। যখন তার খোঁজ পাওয়া গেল তখন লক্ষ্মণ এক কুমোরের বাড়িতে কাজ করছে। লক্ষ্মণের মুখ দিয়ে সোনা ঝরে তাই তাকে ছাড়তে কুমোর রাজি হয় না। শেষে অনেক টাকা কড়ি দেওয়ায় সে লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিলে। সীত-লক্ষ্মণের মিলন হল।

এদিকে ওদের বাবার বয়স হয়েছে, রোগও হয়েছে। দু-ভাই সেদিকে কোন নজর দিল না। তারা তাদের ধাইমা উপরাণীকে আনিয়ে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

লক্ষ্য করবার বিষয়—সুখের সমাপ্তি হলেও এ গল্পে প্রত্যাবর্তন নেই।

রামের পরিবর্তে সীত নাম দেখে সহসা মনে হতে পারে গল্পটিতে[১] নাম বদল হয়ে গেছে। সীতারাম ও রাম লক্ষ্মণ এ দু-জোড়া নাম থেকে একটির প্রথম ও অপরটির শেষ নাম নেওয়া হয়েছে। এ অনুমান অসঙ্গত নয়। তবে তার চেয়েও সঙ্গততর অনুমান হলো যে গল্পটিতে আসলে সীতা নামই ছিল এবং সে ছিল লক্ষ্মণের বোন। পাট-হাতির পিঠে চড়ে সীত শান্তভাবে সবকিছু মেনে নিয়েছিল। তাতে তার নারীত্বই বোঝায়। ভাইয়ের সঙ্গে মিলনের পর তারা যে বাপের কাছেই ফিরে যায়নি সে ব্যাপারও এই সম্পর্কে লক্ষণীয়। সীতাকে পাট-হাতি তুলে এনে রানী করে দিয়েছিল ব্যাপারটি সীতাহরণেরই মতো।

দুভাই সীত-লক্ষ্মণের গল্প খাস বাংলা দেশে আরও কিছু বিকৃতি লাভ করেছে পাত্র নামে। 'সীত' স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ অর্থে গৃহীত হয়েছে, প্রথমে 'শেবত' ও পরে 'শীত' বলে, এবং সীত শীত হওয়ার পর তেমনি অনিবার্য কারণে 'লক্ষ্মণ হয়েছে 'বসন্ত'। অন্যথা গল্প প্রায় একই রয়ে গেছে। তবে কিছু ঘুর পাক খেয়ে।

গল্পটির একটি বাংলা রূপান্তর আছে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের বইয়ে। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) থেকে বাংলা গল্পটির সার উদ্ধৃত করি।

এক রাজার দুই রাণী। বড়ো রাণী দুয়ো। তার দুটি ছেলে,—সুস্থ, সুশ্রী, সবল। ছোট রাণী সুয়ো। তার তিন ছেলে—রোগা, কুশ্রী, দুর্বল। ছোট রাণী তুক করে বড়ো

১। গল্পটি সংগ্রহ করেছিলেন পাদরি বডিঙ (Bodding)

রাণীকে পাখি করে দিলে আর ছেলে দুটিকে মেরে ফেলবার জন্য বনে পাঠিয়ে দিলে। জল্লাদ ছেলে দুটিকে বনে ছেড়ে দিয়ে এল। তাদের নাম শীত ও বসন্ত। তৃষ্ণায় কাতর শীতের জন্যে বসন্ত জল আনতে গেছে, এমন সময় এক রাজ্যের পাট হাতি এসে শীতকে তুলে নিয়ে সেই দেশের রাজধানীতে গিয়ে রাজার শূন্য সিংহাসনে তাকে বসিয়ে দিলে। বসন্ত ফিরে এসে আর শীতকে দেখতে পেলে না। তার পর বসন্ত এক মুনির সেবকরূপে বনেই রয়ে গেল। শীত-বসন্তর মা পাখি হয়ে এক রাজকন্যার মাথায় ঠাঁই পেলে। সেই রাজকন্যা অবিবাহিত। পাখির প্ররোচনায় রাজকন্যা জেদ ধরলে, যে তাকে গজমোতি এনে দেবে তাকেই সে বিয়ে করবে। এই কথা বসন্তর কানে গেল। সে মুনির সাপে তার ত্রিশূল চেয়ে নিয়ে সেই ত্রিশূলের সাহায্যে গজমোতি লাভ করলে। গজমোতি পেয়ে রাজকন্যা খুশি হয়ে যখন পাখির পরিচর্যা করছিল তখন তার মাথার মধ্যে সতীন যে বাঁড় টিপে দিয়ে তুক করেছিল তা খসে পড়ে আর দুয়োরাণী তাঁর স্বমূর্তি ফিরে পান। মা তাঁর দু ছেলে ফিরে পেলেন। বসন্তর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল।

এ গল্পে দুটি কাহিনীর জোড় আছে। উপক্রমে শীত-বসন্তর কাহিনী। বনে তাদের ছড়াছড়ি পর্যন্ত। বাকি অংশ বলতে গেলে মূল গল্প, দুয়োরানী বসন্ত ও রাজকন্যার কাহিনী। শেষকালে জোড়াতালি করে দুটি গল্প মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম কাহিনী সাঁওতাল গল্পটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপান্তর। মূল গল্পে ছিল রাজসন্তান ভগিনী-ভাই, সীতা ও লক্ষণ। সাঁওতালি (এবং বাংলা) গল্পে তারা দুভাই হয়। সীতা হয় "সীত"। বাংলায় স্বাভাবিকভাবেই "সীত" হয়েছে "শীত"। অন্যথা নামটি অর্থহীন ও অসমঞ্জস হয়। এখন মনে হতে পারে রাম কেন লক্ষ্মণ হলেন ? এ নাম পরিবর্তনের হেতু কি ? সে হেতুর সন্ধানে গেলে আমরা রামকথার এক প্রত্নরূপে পৌঁছব। এ প্রত্নরূপে দুভাইয়ের বদলে ছিল ভাইবোন। (তুলনীয় জাতক গল্পের বীজে পাই দুভাই এক বোন।) বোনের নাম ছিল সীতা এবং ভাইয়ের নাম ছিল লক্ষ্মণ, অর্থাৎ সুলক্ষণ, লক্ষ্মীপুরুষ। অর্থাৎ সীতা-লক্ষ্মণ মানে ছিল চাষ-চাষী। পরে "রাম" অর্থাৎ বিশ্রাম, শান্তি যুক্ত হল লক্ষ্মণের সঙ্গে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য জৈন রাম-কথা। এখানে রামের তুলনায় লক্ষ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে।) সাঁওতাল গল্পে যেমন তেমনি বাংলা গল্পের মূলেও 'লক্ষ্মণ' নাম ছিল। সীত "শীত" হওয়াতে লক্ষ্মণ স্বাভাবিক ভাবেই "বসন্ত" হয়েছে। মূলে এখানে 'রাম' থাকলে যদি তা বদলাত তবে দু-অক্ষরের অন্য নাম হত, যেমন "জাড়", "মাঘ" বা অমনি কিছু।

সাঁওতাল ও বাংলা গল্প দুটির মধ্যে রাম-কথার এমন এক প্রাক্তন রূপ পাওয়া গেল যেখানে পাত্রপাত্রী দুজন মাত্র, এবং তারা ছিল ভাই বোন।

বাংলা গল্পটির দ্বিতীয় আখ্যানে রাম-কথার সঙ্গে মিল রাখবার অল্পসল্প চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয়। সুয়োরাণীর তিন ছেলে করে মোট সংখ্যা পাঁচ রাখবার চেষ্টা হয়েছে, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ও সীতা।

॥ ৬ ॥

প্রথম কাহিনীর উড়ো বীজ ঋগ্বেদকেও এড়িয়ে যায় নি। দশম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় শ্লোকে এর আভাস পেয়েছি।

ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎ
স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর্ দ্যুভির্ অগ্নির্ বিতিষ্ঠন্
রুশদ্ভির্ বর্ণৈর্ অভি রামম্ অস্থাৎ॥

'শ্রীমান্ পুরুষ এলেন শ্রীমতী নারীর সঙ্গে। প্রেমিক ভগিনীর পিছনে পিছনে আসছে। সমুজ্জ্বল দ্যুতি নিয়ে স্থির হয়ে অগ্নি জ্যোতির্ময় আভায় রামকে বিদায় দিলেন॥'

এখানে ভদ্র=রামভদ্র, ভদ্রা—সীতা, স্বসা—সীতা, জার—লক্ষ্মণ, অগ্নি—দশরথ। তা ছাড়া 'রাম' কথাটিও রয়েছে। আমার অনুমানে এখানে প্রথম কাহিনীর একটি ছবি উঠেছে।

প্রথম কথার বিষয়ঃ বনবাস অথবা নির্বাসন। প্রতিনায়ক নেই।

দ্বিতীয় কথার বিষয়ঃ পত্নী অপহরণ-উদ্ধার। এই কাহিনীর বিস্তৃতি ও বিচিত্রতা সমধিক। প্রথম কথায় প্রতিনায়ক বলতে প্রত্যক্ষে কেউ নেই। নায়কের বিরুদ্ধতা সবই ভূমিকায় ঘটে গেছে। দ্বিতীয় কথায় প্রতিনায়ক মায়াবী তপস্বী অথবা দানব। নায়ককে জয়লাভ করবার জন্যে ত্রিবিধ শক্তির সাহায্য নিতে হয়—স্থলশক্তি, জলশক্তি ও অন্তরিক্ষ শক্তি। বিভিন্ন উড়ো বীজে ঘটনার বিভিন্নতা সত্ত্বেও নায়কের শক্তি ও প্রতিনায়কের শক্তি ব্যাপারে মিল দেখা যায়। এ কথার উপক্রমে অধিকাংশ উড়োবীজে নায়কেরা তিন ভাই পাওয়া যায়, তাদের তিন ভগিনীপতি। এরাই পরে সাহায্য করেছিল। রাজার ছেলেরা সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল পিতার প্ররোচনায়। নায়ক পত্নী সংগ্রহ করেছিলেন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে।

দ্বিতীয় কথায় প্রতিনায়কই ঘটনাবলীর নিয়ন্তা।

দ্বিতীয় কথার বহু উড়ো বীজ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অনেকটা একই ধরনের উড়ো বীজের সাতটি গল্প এখানে বলছি। একটি গল্প বাংলা দেশের (তবে ইংরেজী অনুবাদে পাওয়া)[১], একটি সার্বিয়-লিথুয়ানিয়, একটি হাঙ্গেরিয় ও তুর্কি, একটি আলবানিয়, একটি আইরিশ ও দুটি রুশিয়।

প্রথমে বাংলা গল্পটির যথাযথ অনুবাদ দিই।

এক ধার্মিক ব্রাহ্মণের এক ছেলে আর তিন মেয়ে ছিল। সকলেই সভ্যভব্য ও সুশ্রী। মরবার আগে বামুন ছেলেকে বলে গেল,—'যার-তার সঙ্গে বোনদের বিয়ে দিও না। যে-সে মেয়েকেও তুমি বিয়ে ক'রনা।' বামুনের মৃত্যুর পর বছর খানেক কাটল। মেয়েরা সুন্দরী বলে ইতিমধ্যে তাদের অনেক সম্বন্ধ এল। সবই সাধারণ ঘরের বলে তাদের প্রত্যাখ্যান করা হ'ল। একদিন হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি। ঘন ঘন বজ্রপাত। এমন সময় বামুনের ঘরে ঢুকল উজ্জ্বলকান্তি সৌম্যমুখ এক যুবক। বিস্ময়াহত হয়ে বামুনের ছেলে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলে—'কে তুমি?' 'ও! আমি ঝড়ের ঠাকুর'—সে বললে, 'তোমার বড়ো বোনকে বিয়ে করে নিয়ে যাব বলে এসেছি।'

১, গল্পটি শশীচন্দ্র দত্ত তাঁর উপন্যাসের—নাম The Young Zaminder (১৮৭৪ ?)—মধ্যে দিয়ে গেছেন ('The Sevait's Story')।

'বেশ নিয়ে যাও ওকে। ঈশ্বর তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন।' —বামুনের ছেলে বললে। তারপর ঝড়ের ঠাকুর বড়ো বোনকে বিয়ে করে ঘরের চৌকাট পার হতেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পরের বছর একদিন হঠাৎ দারুণ ভূমিকম্প হ'ল। স্থানে স্থানে মাটি ফেটে চৌচির হ'ল। হঠাৎ এক বলবান্ সুদর্শন যুবক বামুন-ছেলের ঘরে এসে ঢুকল।

'কে তুমি ?'—জানতে চাইলে বামুন-ছেলে নবাগতর কাছে, আগেকার মতোই। 'ও! আমি ভুঁইচাল ঠাকুর। তোমার মেজো বোনকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে এসেছি।' বামুন-ছেলে বললে, 'বেশ, নিয়ে যাও ওকে। ঈশ্বর তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন।' তারপর ভুঁইচাল ঠাকুর মেজো বোনকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে মাটির তলায় নেমে গেল।

তারপরের বছরে এল ভয়ঙ্কর বান। সমুদ্রের হাঙ্গর, কুমীর দলে দলে চরে বেড়াতে লাগল। এমন সময়ে ঘরে ঢুকল এক সাহসী বীর যুবক। তাকে জিজ্ঞাসা করলে বামুন-ছেলে আগেকার দুবারের মতোই—'কে তুমি ?' 'ও, আমি জল-ঠাকুর। তোমার ছোট বোনকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে এসেছি।' 'বেশ নিয়ে যাও ওকে। ঈশ্বর তোমাদের দুজনের মঙ্গল করুন।' জল-ঠাকুর বামুন-ছেলের ছোট বোনকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ঢুকে গেল।

বোনেদের বিয়ে-থা হয়ে যাবার পর একদিন তার মনে ভাবনা জাগল,—'বাবা যেমনটি বলেছিলেন তেমনি তো বোনেদের বিয়ে হয়ে গেল। এখন আমি ঘর করবার জন্যে অ-সাধারণ কনে পাই কোথায় !' তার মনের ভাবনা মুখ ফুটেও বেরল। কাছে এক গাছে এক পাখি বসেছিল। সে ওর মনের কথা শুনতে পেলে। পাখি চমৎকার দেখতে—নানা রঙের পালকের ডানা তার। পাখি বললে, 'বনের মধ্যিখানে এক অত্যন্ত অ-সাধারণ মেয়ে দেখেছি। সে এক দানবের কন্যা। বাপ তাকে খুব ভালোবাসে। সর্বদা নজরে নজরে রেখে রক্ষা করে। মেয়েটি তোমার বোনেদের চেয়েও ভালো দেখতে। তার মুখে কথা ঝরে যেন জ্ঞানের মুক্তোঝুরি।'

বামুন-ছেলে পাখিকে বললে, 'পাখি—তাকে পাই কি করে ?" পাখি বললে, 'তার বাবা রাত্রির বেলায় চরতে যায়। যদি তুমি সেই সময়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে ভুলিয়ে আনতে পার তো হয়।'

বামুন-ছেলে সাহসী ছিল, তার মনেও বেশ উৎসাহ ছিল। সে একদিন রাত্রিকালে একলা বনের মধ্যে চলে গেল। ঘুরে ঘুরে সে দানব-কন্যার বাড়িতে পৌঁছল। তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে শেষে বললে, 'সুন্দর তোমার চোখদুটি। এসোনা আমার সঙ্গে। এ নির্জন বাসে তো জীবনে কোন সুখ পাচ্ছ না। আমার সঙ্গে অন্যত্র গেলে কেমন সুখে থাকব আমরা দুজনে।'

মেয়েটি বললে, 'আমার মত খুব আছে। নির্জনে থেকে আমি তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি। কেনই যে আমাকে এখানে নজর-বন্দী করে রাখা তাও তো বুঝি না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে এখান থেকে পালান খুব কঠিন। সে চেষ্টায় বিপদও ঢের।'—ছেলেটি উত্তর করলে, 'তবুও আমাকে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। তোমার মতো মেয়েকে পেতে হলে সব কষ্ট বিপদকে তুচ্ছ করতে হয়।'

দানব বাড়ি ফেরার আগেই তারা পালাল। কিন্তু বন পেরিয়ে যেতে পারল না। ধরা পড়ে গেল।

'কি বাছা, ভালোবাসার মানুষ জুটিয়ে আমার কাছ থেকে পালাবে মনে করেছ ? বোকা তুই। যা বাড়ি ফিরে। তোর ভালোবাসার লোককে। আমি জব্দ করে যাচ্ছি।' এই বলে দানব বামুন-ছেলেকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে—বনের সব থেকে উচু গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে দিলে—যাতে করে পেঁচা ও অন্যান্য পক্ষী তাকে ঠুকরে মেরে ফেলে। কিন্তু ঝড়-ঠাকুর তাকে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড ঝড় তুলে মাটিতে নামিয়ে আনে আর নির্বিঘ্নে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

রাত্রিতে বামুন-ছেলের ভালো ঘুম হল না। সে মেয়েটির কথাই ভাবতে লাগল। মনে মনে ঠিক করলে— আবার চেষ্টা করবে তাকে উদ্ধার করে আনবার জন্যে। সেদিন রাত্তিরে সে আবার বনে গেল। তাকে দেখে দানবের মেয়ে খুশি হয়ে স্বাগত করে তার গলা জড়িয়ে ধরে রইল বিয়ের মালার মতো।

তারপর সে বললে, 'কেন তুমি আবার এলে? তুমি কি আমার বাবার নিষ্ঠুর শক্তির পরিচয় পাওনি ?' বামুন-ছেলে বললে, 'তোমার মতো রত্ন পেতে হলে—এমন সাহস না করলে হবে না। চল আবার পালাই। এবার হয়ত এড়াতে পারব।' মেয়েটি বললে, 'তুমি বলছ। চল যাই। কিন্তু আমার মন বলছে, আমরা এবারও ধরা পড়ব আর তুমি আরও নিষ্ঠুর শাস্তি পাবে।'

'যা হবার হোক, চল যাই',—এই বলে সে মেয়েটিকে নিয়ে পালাল। কিন্তু এবারও দানব ফিরে আসবার আগে তারা বনের সীমানা পেরতে পারল না। ধরা পড়ল। 'আ! আবার ছোকরা সাহস দেখাতে এসেছ! আগেকার শাস্তির কথা ভুলে গেছ। আচ্ছা এবার তোমাকে মাটিতে পুঁতব যাতে করে আর কখনো দিনের আলো দেখতে না পাও।' এই বলে দানব বামুন-ছেলেটিকে মেরে মাটিতে পুতে রেখে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

ভুঁইচাল-ঠাকুরের নজরে এল শালার দুর্দশা। সে মাটি ফাটিয়ে দিয়ে বামুন-ছেলেকে কবর থেকে উদ্ধার করলে—আর তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলে।

তবুও বামুন-ছেলে দমল না। পরের দিন রাত্তিরে আবার সে বনে দানবের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। তাকে দেখে মেয়েটি খুশি হল বটে কিন্তু আবার বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার জন্যে তাকে ভৎসনা করলে। আবার তারা পালাল। আবার ধরা পড়ল। দানব দেবতাদের অমর আত্মার দোহাই দিয়ে বললে,

'এবার তোকে আমি জলে ফেলে দিচ্ছি। দেখি কি করে উদ্ধার পাস।' এই বলে সে—বামুন-ছেলেকে পাকড়ে ধরে এত জোরে ছুঁড়ে দিলে যে সে বন থেকে একেবারে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল।

জল-ঠাকুর সতর্ক ছিল। সে ঢেউ ঠেলে ঠেলে তাকে ডাঙায় তুলে ফেললে। তারপর নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছে দিলে। মনের মতো মেয়ে পেয়ে তাকে বিয়ে করবার প্রচেষ্টা তিন তিনবার ব্যর্থ হওয়ায় বামুনের ছেলে মুষড়ে পড়ল। তারপর গাছে সেই পাখিকে দেখতে পেয়ে বললে, 'পাখি ভাই, তুমি তো আমাকে বিয়ের পাত্রীর সন্ধান দিয়েছিলে। এখন বল না কি করে তাকে পাই।'

পাখি বললে, 'ভাই, তুমিতো বামুনের ছেলে। আমার মতো তুচ্ছ প্রাণীর কাছে এমন ব্যাপারে পরামর্শ চাইছ! এক কাজ কর। এক ঘটি গঙ্গাজল আর কিছু তুলসী পাতা সঙ্গে নিয়ে যেও এবার। তোমার বৌকে নিয়ে পালিয়ে আসবার সময়ে পিছনে গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে আর তুলসীপাতা বিছোতে বিছোতে এস। কোন দানব তা ডিঙিয়ে এসে তোমাদের ধরতে পারবে না।'

বামুনের ছেলে আবার বনে দানবের বাড়ি গেল, পাখির উপদেশ মত ঘটি ভরে গঙ্গাজল ও সাজি ভরে তুলসী পাতা নিয়ে।

বামুনের ছেলেকে দেখে মেয়েটি যেমন হাসিখুশি হল তেমনি তার প্রাণের আশংকা করে ভীতও হ'ল। সে বললে, 'কেন তুমি আবার এলে? এবার বাবা তোমাকে প্রাণে বাঁচতে দেবে না।' ছেলেটি বললে, 'যা হবার তা হোক। তোমাকে না পেলে বেঁচে আমার সুখ কী? এস, তাড়াতাড়ি পালাই। এবারে ব্যবস্থা করেছি। তোমার বাবা আর নাগাল পাবে না।' আগেকার মতোই তারা পালাল। বামুন-ছেলে পিছনে গঙ্গাজল ছিটোতে আর তুলসী পাতা বিছোতে লাগল। দানব তাদের ধরি ধরি করেও ধরতে পারল না। গঙ্গাজল আর তুলসী পাতায় আটকে পড়ে গেল। সে দুহাতে মাথার চুল ছিঁড়ে চেঁচাতে লাগল।

বাড়িতে এসে তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হল। দুজনে সুখে ঘর করতে লাগল। দানবের মেয়ে ভালো বামুন-গিন্নী হয়েছিল।

> রাম-কথার সঙ্গে মেলাতে গেলে,—বামুন কর্তা = দশরথ। বামুন-ছেলে = রাম। দানব-কন্যা = সীতা। দানব = বাল্মীকি (অথবা রাবণ)।
> পাখি = জটায়ু, সম্পাতি।
> ঝড়-ঠাকুর = হনুমান। জল-ঠাকুর = সমুদ্র। ভুইচাল-ঠাকুরের ইঙ্গিত রয়েছে খোটানী রামকথায়। সীতা-বিবাহেই কাহিনী শেষ।

গল্পকথাটিতে যে ভদ্রবেশ পরানো হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। গঙ্গাজল ও তুলসী-পাতা যথাক্রমে—অলঙ্ঘ্য নদীর ও বনের আবির্ভাবের হিন্দুধর্মীয় রূপান্তর। গল্পটির সঙ্গে আরও কয়েকটি গল্পের অল্পবিস্তর গভীর মিল আছে। সে গল্পগুলি মিলেছে নানা দেশে নানা ভাষায়।

সার্বিয় গল্প 'বাস চেলিক' উপরের বাংলা গল্পের রূপভেদের মতো। গল্পটি সংক্ষেপে বলছি। এক রাজার তিন ছেলে, তিন মেয়ে। রাজা মারা যাবার সময় বলে যান যে যারা মেয়েদের বিয়ে করতে প্রথম আসবে তাদের সঙ্গেই যেন বিয়ে দেওয়া হয়। পরপর তিনজন বিবাহার্থী এল—তিনজন শক্তিশালী অজ্ঞাত পুরুষ। (একজন ড্রাগনদের রাজা, একজন বাজ-পাখিদের (Hawk) রাজা আর একজন ঈগল পাখিদের রাজা।) বড়ো দুভাই তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছিল। ছোট ভাই জেদ করে বিয়ে ঘটিয়ে দেয়। বিয়ে করেই তারা পত্নীকে নিয়ে অন্তর্ধান করে।

বড় দুভাইয়েরও বিয়ে হল। তারপর তিনভাই বেরোল বোনেদের খোঁজ নিতে। পথে রাত্রিতে আলো না থাকায় ছোটভাই আলো খুঁজতে গিয়ে পড়ে এক রাক্ষসের দলে। তাদের মেরে ফেলে। অবশেষে সে পৌঁছয় এক নির্জন রাজপুরীতে। সেখানে রাজা আর রাজ-কন্যা ছাড়া কেউ নেই, সবাই রাক্ষসের পেটে গেছে। ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সে সাপের কামড় থেকে বাঁচায়। রাজা তার সঙ্গে সেই ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেন। একবার রাজা প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে যান। একটি ঘর ছাড়া সব ঘরে জামাইকে প্রবেশ অধিকার দিয়ে রাজা তাকে চাবির তোড়া দিয়ে যান। কৌতূহল বশে জামাই সেই নিষিদ্ধ ঘরটি খোলে। দেখে ঘরের মাঝখানে আষ্টে-পিষ্ঠে শিকলে বাঁধা একটা লোক ঝুলছে। তার সামনে আছে সোনার গামলা-ভর্তি জল। লোকটা তৃষ্ণায় ছটফট করছে। রাজার জামাইকে দেখে সে জল চাইলে। জামাই এক মগ জল

দিলে। আবার জল চাইলে। আরও এক মগ দিলে। সে বললে, 'আমাকে যে এই দুবার জল দিলে তাতে তুমি দুবার প্রাণ ফিরে পাবে।' তারপর বললে, 'আর একমগ জল আমার গায়ে ঢেলে দাও।' তা দিতেই লোকটার শিকল সব পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে গেল। ঘর থেকে সে ঝড়ের মত উড়ে বেরিয়ে গেল। ছোট মেয়ে রাজকন্যাকেও নিয়ে গেল। সে হল চেলিক।

স্বামী বেরল পত্নীর অন্বেষণে। একে একে গেল তিন বোনের কাছে। বোনাইরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। তারপর সন্ধান করে সে পৌঁছল এক পর্বতগুহার মুখে। সেখানে পত্নীর দেখা পেলে। দুজনে পালাল। চেলিক তাড়া করে এসে রাজকন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এই রকম আরও একবার হল। তিনবারের বার চেলিক রাজকুমারকে হত্যা করে রাজকন্যাকে নিয়ে চলে যায়।

ভগিনীপতিরা জর্ডন নদীর পবিত্র জল এনে রাজপুত্রকে বাঁচায়। তারপর তাদের পরামর্শ অনুসারে রাজপুত্র রাজকন্যার মারফত চেলিকের প্রাণবস্তু কী ও কোথায় তা জেনে নেয়। সুদূর দেশে পাহাড়ের উপরে এক বহুরূপী শিয়াল আছে। তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে খাঁচা আছে। সেই খাঁচায় এক পাখি আছে। সেই পাখিই চেলিকের প্রাণ। রাজপুত্র অসাধ্য সাধন করলে। পাখিটাকে মারতেই চেলিক মরে গেল। ভগিনীপতিরা শালা ও তার পত্নীকে যথাস্থানে পৌঁছে দিলে।

এই গল্পে ছোট রাজকুমার = রামের স্থানে লক্ষ্মণ, রাজা = দশরথ, রাজকন্যা = সীতা, রাজকন্যার পিতা = জনক + বাল্মীকি, চেলিক = রাবণ, ভগিনীপতিরা = বানর ও হনুমান। জর্ডনের জল = বিশল্যকরণী।

উপরে বলা সার্বিয় গল্পটির প্রায় যেন পাঠ্যান্তর রূপে একটি গল্প পাই তুর্কি ও হাঙ্গেরিয় ভাষায়। গল্পটির নাম 'ঝড় দানব'। গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

(বাংলা গল্পটির সঙ্গেও মিল আছে গোড়ার দিকে অনেকখানি পর্যন্ত।)

এক রাজার তিন ছেলে, তিন মেয়ে। মৃত্যুকাল আসন্ন হলে পর রাজা বলে গেলেন, যে ছেলে সারা রাত্রি ধরে তাঁর কবরে পাহারা জাগতে পারবে সেই রাজ্যভাগ পাবে আর যে ব্যক্তিরা কন্যাদের বিবাহার্থী হয়ে প্রথম আসবে তাদেরই মেয়ে দিতে হবে। রাজার মৃত্যু হল। তাঁর বড়ো ছেলে কবরে পাহারা দিতে গেল। মাঝ রাত হতেই অন্ধকারের মধ্যে সে চীৎকার শুনতে পেলে। তাই শুনেই সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। তার পরের রাত্রিতে মেজো ছেলে গেল। তার দশাও সেইরকম হল। তার পরের রাত্রিতে ছোট ছেলে গেল। সে অন্ধকারের মধ্যে থেকে থেকে ভীষণ চীৎকার শুনেও ভয় পেলে না। তার কোমরে ছোরা বাঁধা ছিল। সে নির্ভয়ে এগিয়ে চলল চীৎকার যে দিক থেকে আসছিল সে দিকে। কিছুদূর গিয়ে সে দেখলে যে এক বিরাট ভীষণ মূর্তি জীব (Dragon) দেখতে পেলে। ড্রাগনকে সে বধ করলে। তারপর সে আলোর খোঁজে এগিয়ে চলল। একটু পরে সে এক ঘরের কাছে এল, সেখান থেকে একটু আলো আসছিল। সে দেখলে এক বুড়ো কালো সাদা দুটো সুতোর গুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কালো গুটিটা সে গুটোচ্ছে আর সাদা গুটিটা গড়িয়ে যাচ্ছে। ছোট রাজকুমার তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ও তুমি কি করছ বাবা?' সে বললে, 'আমার কাজ করছি, রাত গুটোচ্ছি, দিন খুলছি।' এই শুনে রাজকুমার তাকে এমন করে বেঁধে ফেললে যাতে সে সুতো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে না পারে। সেখান থেকে সে বেরল আলোর খোঁজে। পৌঁছল এক রাজপ্রাসাদের উঁচু পাঁচিলের গায়ে। সেখানে

চল্লিশজন দস্যু বসে পাঁচিল ডিঙোবার পরামর্শ করছিল। দস্যুদের সাহায্য করবার ছলে রাজকুমার তাদের একে একে সব কেটে ফেললে। তারপর উপরে গিয়ে বন্ধ দরজা খুলে তিন ঘরে তিন অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ঘুমচ্ছে দেখতে পেলে। শেষের ঘরের মেয়েটি সবথেকে সুন্দরী, আর তার ঘর ধাতুর পাতে আগাগোড়া মোড়া ছিল। সে ঘরের দরজায় সে ছোরা মারলে। তারপর ছোট রাজকুমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। ফিরে গিয়ে বুড়োর বাঁধন খুলে দিলে আর যে ড্রাগনটাকে মেরেছিল তার নাক কান কেটে নিয়ে পকেটে ভরলে। তারপর বাড়ি ফিরে এল। দেখলে বড় ভাই সিংহাসন অধিকার করেছে।

কিছুদিন পরে এক সিংহ এল বড়ো রাজকুমারীকে বিয়ে করতে। বড়ো ভাই রাজি হয়নি, ছোট ভাইয়ের কথায় বিয়ে হল। তারপরে এল মেজো কুমারীকে বিয়ে করতে এক বাঘ। তার সঙ্গেও বিয়ে হল ছোটরাজকুমারের কথায়। তেমনি করে ছোট-রাজকুমারীর বিয়ে হল পাখির সঙ্গে। সে পাখি যে সে নয়, পাখিদের রাজা—'সবুজ-অঙ্ক' (Emerald Anka)।

যে রাজবাড়িতে চল্লিশজন দস্যু হানা দিতে গিয়েছিল তার রাজা সকালে উঠে কাটা সাপ ও পাঁচিলের ধারে কাটা দস্যুদের স্তূপ দেখে অবাক্ হয়ে গেল। তারপর রাজা এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে চারদিকে খবর পাঠিয়ে দিলে। তার ধারণা যে ব্যক্তি তার মেয়ের ঘরের দরজায় ছোরা গেঁথে গেছে সেই তাদের উদ্ধারকর্তা এবং সে এই ভোজে আসবে। তিন রাজপুত্র ভাইয়েরা এসেছিল। ছোট রাজপুত্রের কোমরে খালি ছুরির খাপ দেখে তাকে রাজা উদ্ধারকর্তা বলে বুঝতে পারলে।' তাকে পুরস্কার দিতে গেলে সে তার ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে। রাজা বললেন,—সে তো সম্ভব নয়। ও মেয়ের উপর ঝড়-দানব নজর দিয়েছে। তাই তাকে ধাতুর পাতে মোড়া ঘরে রাখা হয়েছে। তবুও রাজকুমার জেদ করতে লাগল। অবশেষে বিয়ে হল। অপর দুই রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হল বড়ো দু-ভাইয়ের সংগে। তারা বিয়ে করে বৌ নিয়ে বাড়ি চলে গেল। ছোট রইল শ্বশুর-বাড়িতে। ছোট রাজকুমার একদিন অল্পক্ষণের জন্য শিকার করতে বেরল। সেই অবসরে ঝড়-দানব এসে তার বৌকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। তারপর ছোটরাজকুমার বেরল পত্নীর খোঁজে। তার দেখা ও মিলন হল তার তিন বোন ও তাদের স্বামীর সঙ্গে। ছোট বোনের স্বামী পাখিদের রাজা রাজপুত্রকে ঝড়-দানবের প্রাসাদের সন্ধান বলে দিলে।

ঝড়-দানব চল্লিশদিন করে একটানা ঘুমোয়। তার ঘুমোবার সময়ে রাজকুমার গিয়ে পত্নীকে উদ্ধার করে নিয়ে চলল। ঘুম থেকে উঠে দানব তাদের ধাওয়া করলে আর ছোট-রাজকুমারকে হত্যা করে মেয়েটিকে আবার নিয়ে এল। যাবার আগে মেয়েটি স্বামীর হাড়গোড় কুড়িয়ে থলি বোঝাই করে তারা যে ঘোড়ায় আসছিল তার পিঠের উপর চাপিয়ে দিলে। সে ঘোড়া এসে পৌঁছল পরীদের রাজা পাখির প্রাসাদে। পরীদের রাজা স্বর্গোদ্যান থেকে জল আনিয়ে তা ছিটিয়ে রাজকুমারকে জীবিত করলে।

রাজকুমার আবার পত্নীকে উদ্ধার করে আনতে চলল। পরীর রাজা তাকে বলেছিল—সে যেন পত্নীকে দিয়ে ঝড়-দানবের মর্ম (talisman) কী ও কোথায় তা জেনে নেয়। নইলে তাকে (ঝড়-দানবকে) পরাজিত করা যাবে না। স্বামীর কথামত মেয়েটি ঝড়-দানবকে ভুলিয়ে তার মর্মরহস্য জেনে নিলে। ছ সাগর পেরিয়ে সাত সাগর। সে সাগরে এক বড়ো দ্বীপ। সে দ্বীপে চরে এক ষাঁড়। সেই ষাঁড়ের পেটে এক সোনার খাঁচা। তার মধ্যে আছে এক সাদা ঘুঘু। সেই ঘুঘুই ঝড়-দানবের মর্মবস্তু। সে দ্বীপে পৌঁছবার উপায়ও ঝড়-দানবের কথায় জানা গেল।

রাজকুমার সাতসাগরের দ্বীপে পৌঁছল। সেখানে ষাঁড়কে মেরে খাঁচা শুদ্ধ পাখি নিয়ে এলো ঝড়-দানবের প্রাসাদে। তারপর পাখিকে মেরে ফেললে। তারপর পত্নীকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করলে।

গল্পটির নায়ক রাজার সত্যসন্ধ ছোটছেলে—রামকথার লক্ষ্মণ। রাজ্যলাভের জন্যে পরীক্ষা ও বিবাহ জনকতনয়ার বিবাহের মতো।

প্রতিনায়ক নামেও যা কাজেও তাই। আগেকার আইরিশ গল্পের মতো বৈদিক দেবতার পর্জন্য বায়ু-বাতের অপর রূপ। "ঘোষা ইদ্ অস্য শৃণ্বিরে ন রূপম্" অর্থাৎ 'এর হাঁক শোনা যায় রূপ দেখা যায় না'। মর্মস্থানের উল্লেখ সার্বিয় গল্পটির সঙ্গে ও সিয়ামী রামকথার সঙ্গে তুলনীয়। ঝড়-দানবের একটানা চল্লিশদিন, অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল ধরে ঘুমিয়ে থাকা রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণকে স্মরণ করায়। রাবণের মতো ঝড়-দানবের গুপ্ত-পুরীও লঙ্কার মতো দূরে সাগরের মধ্যে দ্বীপে।

নায়কের ছোট ভগিনীপতি রামকথার জটায়ু সম্পাতি স্থানীয়। আর সিন্ধু ঘোটক যাতে চড়ে নায়ক প্রতিনায়কের গুপ্তপুরীতে গিয়েছিল ও ফিরে এসেছিল সে হল হনুমানের স্থানীয় অথবা সেতুবন্ধনের তুল্য। নায়কের পুনরুজ্জীবন ব্যাপারও রামকথার অনুযায়ী। গল্পটি খ্রীষ্টানের মুখে শোনা তাই স্বর্গোদ্যানের (Eden Garden) জল এনে তাকে জীবিত করা হয়েছিল।

প্রতিনায়কের মা এ গল্পে তিন ভগিনীতে পরিণত হয়েছে। ঘরের কোণের বুড়ো বৈদিক অশ্বিদ্বয়ের (অথবা নক্ত ও উষার) প্রতীক, এর প্রতিচ্ছবি আছে একটি রুশ গল্পে, নাম ভাসিলিশ ও বাবাইয়াগ। তাতে বুড়োর ব্যাপারটি কালো, লাল, সাদা তিন ঘোড়ার উপর তিন বীর রূপে মিলছে।

আলবানিয়ার একটি গল্প মিলেছে যার সঙ্গে উপরের গল্পটির আংশিক, তারও উপরের গল্পটির সঙ্গে আরও বেশি মিল আছে। গল্পের নাম 'তিন ভাই আর তাদের তিন বোন'। গল্পটি বলি।

তিন ভাই ও তিন বোনের সংসার। বাপ-মা নেই। ভাইয়েরা বোনেদের বিয়ে দিলে। বড়োর হল সূর্যের সঙ্গে, মেজোর চাঁদের সঙ্গে আর ছোটর দখনে বাতাসের সঙ্গে। কিছুকাল পরে ভাইয়েরা বেরল বোনেদের খবর নিতে। পথে রাত্রিতে তারা এক পাহাড়ের গোড়ায় বিশ্রাম নিলে। আগুন জ্বালালে। দুজন করে ঘুমতে লাগল, একজন করে পাহারায় রইল। সেখানে পড়ল তারা এক রাক্ষসীর পাল্লায়। বড়ো ভাই ছিল পাহারায়, সে রাক্ষসীকে মেরে ফেললে। পরের দিন তারা যেখানে ডেরা করলে রাত্রিবেলায় সেখানেও আগুন জ্বলতে দেখে রাক্ষসী এল। পাহারা দিচ্ছিল মেজো ভাই। সে রাক্ষসীকে মেরে ফেললে। পরের দিনও তেমনি ঘটল। সেদিন ছোট ভাই অনেক কাকুতি-মিনতি করে পাহারা দেবার ভার আদায় করেছিল। যে রাক্ষসী এল তাকে সে মেরে ফেললে। কিন্তু হলে হবে কি, রাক্ষসীর লেজের ঝাপটায় তাদের আগুন নিভে গেল।

তখন ছোটভাই চলল আগুন আনতে। হাতে নিলে একটা পোড়া কাঠ। দূরে আগুন জ্বলতে দেখে সে এগিয়ে গেল। তার দেখা হল এক বুড়ীর সঙ্গে। সে বুড়ী হল দিনের আলোর মা। 'কে তুমি কোথা থেকে আসছ ? কোথায় যাবে ?'—প্রশ্ন করলে তাকে ছোট ভাই। বুড়ী বললে, 'আমি পূব থেকে আসছি—উষাকে নিয়ে, তোমার সঙ্গে গল্প করার ফুরসত আমার নেই।'

ছোট ভাই বুড়ীর হাতে চুমু খেয়ে বললে, 'আইমা তোমাকে একটু সবুর করতে হবে। একটু আমাকে সময় দাও, আমি ওই ওখানে যে আলো জ্বলছে—তার থেকে আমার এই কাঠ জ্বালিয়ে আনি। দিন ফুটে গেলে আমি আর দূর থেকে আগুন টের পাবে না।' । বুড়ী তার কথায় রাগ করলে না। বললে—'বেশ। আমি অপেক্ষা করছি।' কিন্তু বুড়ীর কথায় সে বিশ্বাস করলে না। নিজের কোমর বন্ধ খুলে তাই দিয়ে বুড়ীকে বেঁধে দিলে এক গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

আগুন আনতে গিয়ে সে পড়ল ডাকাতের পাল্লায়। তারা বারো জন। ছোটর শক্তির পরিচয় পেয়ে তার সাহায্য চাইলে—রাজার ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া চুরি করবার জন্যে। প্রাচীর পেরোবার সময় সাহায্যের অছিলায় সে ডাকাতদের এক এক করে সবাইকে মেরে ফেললে। তারপর সে রাজবাড়িতে ঢুকল। উঠোনে একটা কুয়া দেখে সে কুয়ার কাছে গিয়ে কুয়ার গাঁথনির ফাঁকে তার রক্তমাখা তলোয়ার গুঁজে রেখে দিলে। তারপরে সে ফিরে এল বুড়ীর কাছে। তার বাঁধন খুলে দিলে। তারপর ভাইদের কাছে ফিরে এসে আগুন জ্বাললে।

রাজার বাড়িতে ছোটভাই ডাকাত মেরেছিল—সে বাড়িতে সকাল বেলায় হুলস্থুল পড়ে গেল। রাজা মহাভাবনায় পড়লেন, কুয়ার পাড়ে রক্তমাখা তলোয়ার কার—? অনেক খোঁজ হল। কোথাও সন্ধান মিলল না। শেষে বড়ো রাস্তার চৌমাথায় রাজা এক সরাইখানা খুললেন। সেখানে থাকা-খাওয়ার জন্য পয়সা লাগবে না। তার বদলে আগন্তুকদের নিজের নিজের কাহিনী বলতে হবে। রাজার উদ্দেশ্য, এইভাবে একদিন তলোয়ারের মালিককেও চেনা ও ধরা যাবে। অবশেষে তাই ঘটল। ছোটর মুখে তার কাহিনী শুনে সরাইখানার অধ্যক্ষ রাজার কাছে নিয়ে গেল। তার সঙ্গে রাজা মেয়ের বিয়ে দিলেন।

রাজার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে জেলের কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু একজন বিকট কয়েদীকে ছাড়া হল না। সে আধা-মানুষ, আধা লোহা। তাকে ছেড়ে দেবার জন্য ছোট রাজাকে খুব অনুরোধ করায় তাকেও ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সে ছাড়া পেয়েই রাজকন্যাকে নিয়ে উধাও হল। এদিকে রাজা রাগে জামাইকে কেটে ফেলে আর কি,—জামাই বিনয় করে বললে, 'আমাকে লোহার জুতো আর লাঠি করিয়ে দিন। আমি বছর না ঘুরতেই আপনার মেয়েকে উদ্ধার করে আনব।' রাজা তাই করে দিলেন। ছোট পত্নীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। গেল সে একে একে তিন বোনের বাড়িতে। শেষে সন্ধান মিলল ছোট বোনের কাছে। সে পাঠালে ভাইকে এক বিরাট বাজপাখির (falcon) কাছে। সে এত মোটা যে উড়তে পারে না। তার কাছে গিয়ে ছোট সন্ধান চাইলে। আধা-মানুষ আধা-লোহার বাড়িতে পত্নীর সঙ্গে দেখা হল। আধা-মানুষ আধা-লোহা জানতে পেরে তাকে ধরে মেরে রক্ত পান করে দেহটাকে বাইরে ফেলে দিলে। বাজপাখি তখন সুদূর পর্বত থেকে সোয়ালো পাখির দুধ এনে খাইয়ে ছোটকে বাঁচালে। তারপর মরণান্তিক অসুখের ভান করে রাজকন্যা আধা-মানুষ আধা-লোহার প্রাণ কোথায় তা জেনে নিলে। সে প্রাণ ছিল উলটো দিকে পাহাড়ে এক বনশুয়ারের সোনা-রুপোর দাঁতের ভিতরে এক খরগোসের পেটের মধ্যে তিনটি পায়রা রূপে। ছোট সেই পাহাড়ে গিয়ে বনশুয়ার মেরে তার সোনা-রুপোর দাঁতের মধ্যে থেকে খরগোস বার করে তার পেট চিরে তিনটা পায়রা বার করে একে একে তাদের মুণ্ডু কেটে দিলে। অমনি আধা-মানুষ আধা-লোহা মরে গেল। বাজপাখির পিঠে চড়ে ছোটর সঙ্গে রাজকন্যা তার বাপের বাড়ি ফিরে এল।

এই গল্পেও প্রথম রাজা=দশরথ, দ্বিতীয় রাজা=জনক, ছোটরাজকুমার=লক্ষ্মণ (রামের স্থানীয়), বাজপাখি=জটায়ু (হনুমান)। আধা-মানুষ-আধা-লোহা=রাবণ। (তিনটে পায়রার তিনমুণ্ড কাটার মধ্যে দশগ্রীবের ইঙ্গিত আছে মনে করি)। গল্পটিতে বিশেষত্ব হল বড়ো দু-ভাইকে খর্ব করা হয়নি। দিনের আলোর মা বুড়ীকে আমরা পরের কোন কোন গল্প নতুন সাজে দেখব।

এখন বলি প্রথম রুশ গল্পটি। গল্পের নাম 'মারিয়া মোরেভ্না।' গল্পটিতে যুগোশ্লাভ গল্পের আর এক এবং অভিনব রূপান্তর পাচ্ছি পূর্ণতর ভাবে।

সুনীল সমুদ্রের কিনারা থেকে অনেক অনেক দূরে থাকত এক রাজকুমার (Tzarevich) নাম আলেক্সিস্ (Alexis) ও তার তিন বোন—রাজকুমারী (Tzarevna) নাম—আন্না (Anna), ওলগা (Olga) আর হেলেনা (Helena)। মা আগেই মারা গিয়েছিল, বাবা মারা যাবার সময়ে মেয়েদের তাঁর ছেলের হাতে দিয়ে বলে যান—যেন যথা সময়ে সে বোনেদের বিয়ে দেয় আর প্রথমেই যে প্রার্থী আসবে, মেয়ের অমত না হলে তারই সংগে যেন বিয়ে দেওয়া হয়। পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝা তুলে আবির্ভাব হল এক বিচিত্র শ্যেন পাখির (Hawk)। সে ঘরে ঢুকতেই সুন্দর পুরুষের রূপ পেলে। সে আন্নাকে বিয়ে করতে চাইলে। তাদের বিয়ে হল। তারা চলে গেল। বছর খানেক পরে আবার একদিন তেমনি ঝড় উঠল। সেদিন এল এক বড় কালো ঈগল পাখি। সেও ঘরে ঢুকে সুন্দর যুবক হয়ে গেল। সে ওল্গাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। তার পরের বছর একদিন তেমনি করে এল আর ঘরে ঢুকে মানুষ হয়ে গেল এক প্রকাণ্ড দাঁড়কাক। সে হেলেনাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। বোনেরা চলে যেতে আলেক্সিস্ কোন রকমে একটা বছর বাড়িতে কাটিয়ে তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল বোনেদের খবর নিতে। তিনদিন ঘোড়া হাঁকাবার পর সে পৌঁছল এক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। সেখানে অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র ও মৃত ঘোড়া ও সেপাই পড়েছিল। সেপাইদের মধ্যে একজন তখনও বেঁচেছিল। তার মুখে আলেক্সিস্ শুনলে যে এই যুদ্ধে যিনি জয় করে গেছেন তাঁর নাম মারিয়া মোরেভ্না। তিনি তিন মায়ের মেয়ে, ছ দিদিমার নাতনি, ন'ভাইয়ের বোন, রাজার সুন্দরী কন্যা। এই কথা বলেই সেপাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। আলেক্সিস এগিয়ে চলল। অবশেষে পৌঁছল সে মারিয়া মোরেভ্নার শিবিরে। তার সঙ্গে পরিচয় হল। আলেক্সিসের ভ্রমণের কারণ জেনে নিয়ে মারিয়া তাকে কিছুকাল আতিথ্য স্বীকার করতে বললে। আলেক্সিস্ রাজী হল। তাদের মনে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হল। আলেক্সিসকে নিয়ে মারিয়া রাজপুরীতে চলে গেল। দুজনের বিবাহ হল।

একদিন মারিয়ার রাজ্যের এক প্রান্তে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাকে যেতে হল যুদ্ধ করে সে বিদ্রোহ দমন করতে। সেনাবাহিনী নিয়ে যাবার আগে মারিয়া বলে গেল,—আলেক্সিস্ যেখানে খুশি বিচরণ করতে পারে কিন্তু সে যেন মারিয়ার অন্তঃপুরে যে ঘরটিতে তালা দেওয়া আছে, তা যেন কিছুতেই না খোলে। নিষেধে কৌতূহল বাড়ায়। আলেক্সিস্ সে ঘর খুললে। দেখলে আষ্টেপৃষ্ঠে লোহার শিকলে বাঁধা একটি লোক কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে। আলেক্সিস্ তার পরিচয় চাইলে সে বললে তার নাম যাদুকর কাস্ৎচে, তাকে এমনি করে বেঁধে রেখে যন্ত্রণা দিচ্ছে মারিয়া মোরেভ্না দশ বছর ধরে। সে অত্যন্ত কাতর ভাবে বলল, 'আমাকে একটু জল দাও। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।' আলেক্সিসের দয়া হল। সে জগ ভর্তি করে জল দিলে। যাদুকর খেয়ে বললে,—'আরও এক জগ দাও, তোমার বিপদে আমিও তোমায় প্রাণ

দোব।' আলেক্‌সিস্‌ আরও এক জগ জল দিল। সে বললে,—'আরও এক জগ দাও, আমি তোমাকে দুদুবার প্রাণদান করব।' আরও এক জগ জল দেওয়া হল। সেটা সে ঢক্‌ ঢক্‌ বরে খেতেই তার মূর্তি পালটে গেল। সে পট্‌ পট্‌ করে লোহার শিকল ছিঁড়ে ঝড়ের মতো জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মারিয়াকেও নিয়ে গেল। আলেক্‌সিস্‌ নিজের বোকামির জন্য দুঃখ করতে লাগল। তারপর সে প্রতিজ্ঞা করে বেরোল যে মারিয়াকে উদ্ধার করবেই।

অনেক পথ যাবার পর তার একে একে দেখা হল তার তিন বোন ও ভগিনীপতিদের সঙ্গে। বিদায় নেবার সময়ে তারা আলেক্‌সিসের কাছে চেয়ে নিলেন স্মারক হিসাবে তার রূপোর চামচে কাঁটা আর নস্যির ডিবে। তারপর অনেকদূর গিয়ে সে কাস্‌ৎচের বাড়ি পৌঁছল। সে বাড়িতে ছিল না। বাগানে মারিয়ার দেখা পেলে। তাকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে পালাল। মারিয়ার পলায়ন বার্তা কাস্‌ৎচের ঘোড়া জানিয়ে দিলে। তখন সে ধাওয়া করে এসে মারিয়াকে কেড়ে নিয়ে গেল। আলেক্‌সিস্‌কে প্রাণে মারলে না। এইরূপ আরও একবার হল। সে আবারও আলেক্‌সিস্‌কে ছেড়ে দিলে। তৃতীয় বার সে আলেক্‌সিসের ঘোড়া কেটে ফেললে আর তাকে পিপেয় পুরে লোহার গজাল মেরে সমুদ্রে ফেলে দিলে। ভাইয়ের এই বিপদ সঙ্গে সঙ্গে বোন ও বোনাইদের গোচর হল, তাদের কাছে আলেক্‌সিস্‌ যে রূপার চামচে কাঁটা ও কৌটো দিয়েছিলে তা কালো হয়ে গেল। বোনাইরা তখন ছুটল। সমুদ্র থেকে পিপে তুলে এনে আলেক্‌সিস্‌কে উদ্ধার করলে। সে তার কথা সব জানালে।

তারপর পরামর্শ-সভা বসল। কাক বোনাই বললে, কাস্‌ৎচের মতো ঘোড়া না পেলে মারিয়াকে উদ্ধার করা যাবে না। আলেক্‌সিসের এখন কর্তব্য হচ্ছে মারিয়াকে দিয়ে কাস্‌ৎচের ঘোড়া কোথা থেকে পাওয়া যায় তা জেনে নেওয়া। আলেক্‌সিস্‌ আবার গেল মারিয়ার কাছে। মারিয়া কাস্‌ৎচেকে ভুলিয়ে তার ঘোড়ার ইতিহাস জেনে নিলে। কাস্‌ৎচে বললে, 'নীল সমুদ্রের তীরে এক মাঠ আছে, সেখানে ঘুরে বেড়ায় এক বিচিত্র মাদী ঘোড়া। বারো জন সর্বদা তার জন্য ঘাস কাটছে। সে ঘাস ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলছে। প্রত্যেক মাসে একটা করে ছানা হয় তার। আর তা সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে তার পিছুলাগা বারোটা নেকড়ে বাঘ। তিন বছর অন্তর সে একটা করে মাদী ছানা প্রসব করে। নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবার আগে যদি কেউ উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারে তবে সেই ঘোড়া আমার ঘোড়ার জুড়ি হবে।' কি করে যে তার ঘোড়া পেয়েছিল সে গোপন কথাও মারিয়া বার করে নিলে। কাস্‌ৎচে বললে,—'ন নয় (অর্থাৎ সাতাশ) রাজ্য পেরিয়ে তিরিশ রাজ্যে আগুন নদীর ওপারে এক খুব বুড়ী ডাইনী (Baba Yaga) থাকে। সে তক্‌কে তক্‌কে থাকে, যখনি মাদী ছানা হয় তখনি সে তা নিয়ে আসে। সে এমনি ঘোড়া অনেক পুষছে। এক সময়ে আমি তিনদিন ঘোড়ার পরিচর্যা করেছিলুম। বুড়ী খুশি হয়ে আমাকে একটি ছোট বাচ্ছা দেয়। সেই বাচ্ছাই বড়ো হয়ে আমাকে কাজ দিচ্ছে।' মারিয়া জিজ্ঞেসা করলে, 'আগুনে নদী তুমি পেরোলে কি করে ?' সে বললে, 'আমার কাছে এক অপূর্ব রুমাল আছে, সেটা ডানদিক ধরে তিনবার নাড়লেই নদীর উপর এমন উঁচু পুল খাড়া হয়ে যায় যে আগুনের শিখা অতদূরে পৌঁছতে পারে না।'

কাস্‌ৎচে ঘুমিয়ে পড়লে মারিয়া আস্তে আস্তে তার বুক পকেট থেকে রুমালখানি নিয়ে নিলে। আলেক্‌সিসকে সেটি দিয়ে ঘোড়ার কথা সব বললে। সে তখন চলল আগুনের নদীর পানে। রুমালের গুণে নদী পেরোল সে। তিনদিন পথ হাঁটার পর সে পেটের দায়ে এক পাখির ছানা ধরলে খাবে বলে। ছানাটির মায়ের প্রার্থনায় সে ছানাটিকে

ছেড়ে দিলে। তারপর সে ঢুকল এক বনে। সেখানে এক মৌমাছির চাক দেখতে পেয়ে সে তা ভেঙে মধু খেতে গেল। রাণী মৌমাছি তাকে চাক ভাঙতে নিষেধ করলে, তাহলে তার প্রজারা আর খেতে পাবে না।

আলেক্সিস্ চাক ভাঙলে না। বন থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছল সমুদ্রতীরে। সেখানে একটা গলদা চিংড়িকে সে নিতে গেল। চিংড়ি বললে,—'আমাকে ছেড়ে দাও। পরে আমি তোমার উপকার করব।' সে ছেড়ে দিলে। তারপর সে ঘুরতে ঘুরতে ভোরের দিকে পৌঁছল বনের মধ্যে। দেখতে পেলে বুড়ী ডাইনীর কুঁড়েঘর। সে ঘর মুর্গির ঠেঙের মাথার উপর বনবন করে ঘুরছে। কুঁড়ের চারদিকে বারোটা খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে, এগারোটা খুঁটির মাথায় মড়ার খুলি বসানো। একটা খালি। কুটীরের সামনে এসে আলেক্সিস্ বললে,—'ছোট কুঁড়ে ছোট কুঁড়ে! দাড়াও খুঁটি তেমনি ভাবে যেমন তোমার মা তোমাকে রেখেছিল, বনের দিকে পিছন আর সামনের দিকে মুখ করে।'

তার দিকে দরজা করে কুঁড়ে স্থির হয়ে গেল। তখন আলেক্সিস মুর্গির ঠেঙ বেয়ে উঠে কুটীরে ঢুকল। দেখলে বুড়ী তুন্দুরের উপর শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আলেক্সিস্ বুড়ীকে জাগালে,—'আইমা ভালো থাকো'—বলে। 'রাজকুমার তুমি ভাল থাক। কেন আমার কাছে এসেছ? নিজের ইচ্ছায় না কাজে পড়ে?'—বুড়ী বললে! আলক্সিস্ বললে—'দুকারণেই, আমি এসেছি তোমার সিন্ধুঘোটক চরাবারকাজ করতে। মাইনে নেব একটি ঘোড়ার ছানা।' বুড়ী ডাইনী বললে,—'বেশ আমার কাছে বারোমাস কাজ কেউ করে না। তিন দিন করে। তুমি যদি ভালো করে কাজ কর তবে বীরের উপযুক্ত বাহন ঘোড়া পাবে। কিন্তু ঘোড়া যদি একটিও হারায় তবে তোমার মাথা ওই খালি খুঁটির উপরে চড়াব।'

কাজের ভার নিয়ে আলেক্সিস্ যেই আড়গড়ার গেট খুলে দিলে অমনি সব ঘোড়া নেজ নাড়তে নাড়তে চারদিকে উধাও হল। তখন হতাশ রাজকুমারের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন সূর্য ডুবু ডুবু তখন তার ঘুম ভেঙে গেল এক পাখির ঠোঁটের মৃদু আঘাতে। এ সেই পাখি যার ছানাকে সে ছেড়ে দিয়েছিল। পাখি বললে, 'দেখ গিয়ে সব ঘোড়া আড়গড়ায় আটক রয়েছে।' সে যেতে যেতে শুনতে পেলে, বুড়ী ডাইনী তার ঘোড়াদের বক্‌ছে,—'কেন তোরা আমার কথা শুনলি না?' ঘোড়ারা উত্তর দিলে,—'কি করব, বিস্তর পাখি এসে আমাদের চোখে ঠোকর মারতে মারতে আড়গড়াতে সেঁদিয়ে দিলে।' তখন বুড়ী বলে দিলে,—'কাল তোমরা বনের মধ্যে ঢুকে নিরুদ্দেশ হ'য়ো।'

পরের দিন ছাড়া পেতেই ঘোড়াগুলো বনের মধ্যে ঢুকে উধাও হল। আগেকার দিনের মতো আলেক্সিস্‌ও কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙাল একটা বড়ো মৌমাছি। মৌমাছি বললে,—'আড়গড়ায় দেখোগে। তোমার ঘোড়া সব ঠিক আছে।' পরের দিন বুড়ীর নির্দেশ মতো সব ঘোড়া ঝাঁপ দিলে সমুদ্রে। সেদিন চিংড়ী মাছেরা দাড়ার চোটে সব ঘোড়া সমুদ্র থেকে খেদিয়ে এনে আড়গড়ায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যে গলদা চিংড়ীকে আলেক্সিস্ ছেড়ে দিয়েছিল সে তাকে এই পরামর্শ দিলে,—'তুমি আজও কুটীরে ফিরে যাও। তবে বুড়ীকে মুখ দেখিয়োনা। ঘোড়ার নাদার মধ্যে লুকিয়ে থেকো। সেখানে দেখবে এক কোণে একটা ছোট ন্যাংলা খোঁড়া বাচ্ছা আছে। ঠিক যখন রাত দুপুর হবে তখন তার পিঠে চড়ে পালিয়ে যেয়ো।' তাই করলে সে। বুড়ী ডাইনী ধাওয়া করলে।

আলেক্‌সিস্‌ বুমাল ডানদিকে নেড়ে সাঁকো তুলে পেরিয়ে এল। তারপর সে বুমাল বাঁদিকে নেড়ে দিলে দুবার। তাতে সাঁকো খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। ডাইনী বুড়ী পেরোতে গেলে ভেঙে পড়ল। বুড়ী আগুনে পুড়ে মারা গেল। আলেক্‌সিস্‌ বারোদিন ধরে সূর্যোদয়ের সময় সবুজ মাঠে ঘাস খাওয়ালে পর ঘোড়া তৈরি হয়ে গেল।

সেই ঘোড়ায় চড়ে সে কাস্‌ৎচের প্রাসাদে গিয়ে মারিয়াকে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে চলল। কাস্‌ৎচেকে তার ঘোড়া সব ব্যাপার জানিয়ে দিতে সেও ধাওয়া করলে। আলেক্‌সিসের নাগাল পেয়ে যখন তাকে কাটবার জন্য তলোয়ার উঠিয়েছে, তখন আলেক্‌সিসের ঘোড়া কাস্‌ৎচের ঘোড়াকে চিনতে পেরে বলে উঠল, 'দাদা দাদা, করছ কী ? এই বদমায়েসটার এখনও দাসত্ব করছ ? দাও ওকে পিঠ থেকে ফেলে পায়ে করে মাড়িয়ে।' ঘোড়া তাই করলে। কাস্‌ৎচে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। আলেক্‌সিস্‌ কাস্‌ৎচের ঘোড়ায় উঠল। মারিয়া আলেক্‌সিসের ঘোড়ায় চড়ল। মারিয়াকে নিয়ে আলেক্‌সিস্‌ বোন ও বোনাইদের সঙ্গে একে একে দেখা করে শেষে নিজের বাড়িতে এসে রাজত্ব করতে লাগল।

এই গল্পের বিশেষত্ব,—রাজকুমার (একজন মাত্র) = রাম, রাজকন্যা মারিয়া = সীতা (কিন্তু বীর নারী। বিবাহ স্বয়ংবরেরই মতো), কাস্‌ৎচে = বাল্মীকি-রাবণ (আইরিশ গল্পের দ্রুইদ), আগুনের নদীতে পুল = সমুদ্রে সেতুবন্ধন। বনের বুড়ী = আগের গল্পের দিনের আলোর মা।

কাস্‌ৎচে শেষ পর্যন্ত মরেনি। কোন কোন রামকথায় রাবণও মরেনি।

নীচের গল্পকথাটিতে রামকথার অখণ্ড পূর্বচ্ছবি আছে।

গল্পটি পুরোন আইরিশ বীর-গাথায়—'লওন দ্যয়রিগ ও ভীষণ উপত্যকার মহাবীর'। ('Lawn Dyarrig and the Knight of Terrible Valley)।

একদা এক রাজা ছিলেন এরিন দেশে। তিনি মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। একজন মহাবীরের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তার মাথা টুপি ফুটে বেরিয়ে পড়েছে, তার কনুই আর হাঁটু পোষাকের থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আর তার পায়ের আঙুল জুতো থেকে বেরিয়ে আছে। লোকটি এগিয়ে এসে রাজার মুখে এক ঘুষি লাগালে। রাজার তিনটি দাঁত খসে পড়ল। রাজার মাথা কাদায় লুটোপুটি হল। রাজা বাড়ি ফিরে এসে মনের দুঃখে বিছানা আশ্রয় করলেন।

রাজার তিন ছেলে। নাম তাদের উর (Ur), আর্থার (Arthur) ও লওন (Lawn = ক্ষেত্র ?) দ্যর্‌রিগ (Lawn Dyarrig)। তারা পাঠশালা থেকে বাড়ি এসে বিকেলে শুনলে বাবা বিছানা নিয়েছেন। তারা বাপের কাছে গেল। রাজা তাদের সব কথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন,—সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হলে তারা কী করবে। বড়ো বললে, 'তার দেখা যদি পাই, আমি তাকে চারটে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে চার খণ্ড করব।' রাজা খুশি হয়ে বললেন,—'তুমি আমার ছেলে বটে।'

মেজো বললে, 'যদি তাকে ধরতে পারি তবে আমি তার চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারব।' রাজা উৎফুল্ল হয়ে বললেন —'তুমি আমার ছেলে বটে'।

ছোট বললে—'যদি তাকে খুঁজে পাই তবে আমি তার সঙ্গে যথাসাধ্য লড়ব। হয়ত সে আমার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।' রাজা বললেন,—'তুমি আমার পুত্র নও। তোমার জন্য আমি আর অর্থ-ব্যয় করব না। তুমি কালই এখান থেকে দূর হয়ো।'

পরের দিন বড়ো দু'ভাই বেরোল সেই লোকটার অন্বেষণে। রাজবাড়ি থেকে বিতাড়িত ছোট ভাই তাদের কাছে এসে বললে,—'তোমরা বড়োলোকের বেটা হয়ে সঙ্গে চাকর না নিয়ে যাচ্ছ, তা ভালো দেখাবে না।' বড়ো ভাইয়ের ইচ্ছা ছিল না, মেজো ভাইয়ের নির্দেশে ছোট ভাই চাকর হয়ে সঙ্গে চলল।

সমস্তদিন পথে চলে তারা দিনের শেষে একটা বাড়ি দেখতে পেলে। সে বাড়িতে আছে শুধু এক বুড়ী। তিনভাইকে অতিথি পেয়ে বুড়ী বড়ো দুজনকে করমর্দন করে স্বাগত জানালে। ছোটকে সে, এরিনের রাজার ছেলে বলে, 'এস-এস' বলে চুমু খেলে। বড়ো ভাই এ ব্যাপার লক্ষ্য করে বললে, 'এ কীরকম হল। ছোটোকে এত খাতির।' বুড়ী বললে, 'সে কথা শুনে কাজ নেই, তাতে তোমার মরণ।' সকাল বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর—বিদায় নেবার সময় এলে বুড়ী বড়োকে পর্যটনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে বড়ো ভাই সব কথা বলে বললে,—'আমি সেই লোকটাকে খুঁজছি জীবিত অথবা মৃত।'

বুড়ী বললে,—'সে তো ভীষণ উপত্যকার শ্যাম বীর। সেই তো তোমার বাপের দাঁত ভেঙেছিল। এখানে আমি তিনশ বছর ধরে বাস করছি। প্রত্যেক বছর দেখেছি তিনশ জন তরুণ বীর যোদ্ধা এখান দিয়ে গেছে কিন্তু তাদের একটিকেও ফিরে আসতে দেখিনি ভীষণ উপত্যকা থেকে।' মেজো ভাইকে জিজ্ঞাসা করায় সেও বললে,—'বড়ো ভাইয়ের মতো আমিও যাচ্ছি।' ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে,—'আমি ওদের চাকর হয়ে যাচ্ছি।'

তারপরে বুড়ী উরকে উদ্দেশ করে বললে,—'একবছর একদিন হল, আমার মেয়ে আভা খোলা জানালার ধারে বসে সেলাই করছিলো। এক খুব ভালো জামাজোড়া পরা মহাবীর (champion) সেখান দিয়ে যাবার সময় আমার মেয়েকে দেখে তার কোমরবন্ধে আঙুল ঢুকিয়ে তাকে নিয়ে উধাও হয়েছে। তার বাবা পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিল। আজ পর্যন্ত মেয়ের বা মেয়ের বাপের খবর পাইনি। সে ব্যক্তি হল ভীষণ উপত্যকার শ্যাম বীর। তার মতো বীর পৃথিবীতে নেই, আমার কথা শোন, বাড়ি ফিরে যাও বাপের কাছে।'

বড়ো রাজপুত্র উর বুড়ীর কথায় কর্ণপাত করলে না। সব বুঝে বুড়ী ছোটকে বললে, 'ও ঘরে যাও, কাপড় চোপড় পর আর এক গাদা তলোয়ারের তলায় যে পুরোন তলোয়ারটা আছে তা নাও।' সে কাপড়চোপড় পরলে। তলোয়ারটা ঠুকতেই তা থেকে সাতমণ মরচে ঝরে পড়ল। তারপর বুড়ি তাকে বললে,—'এগিয়ে পড়ো। একটু এগিয়ে ঘোড়াশাল পাবে। তার থেকে রোগা সাদা ঘোড়াটি বেছে নিও। তোমার ভাইয়েদেরও তোমার পিছনে চাপিয়ে নিয়ো। তবে আমার মতে ওদের সঙ্গে না নেওয়াই ভালো।' সে কিন্তু ভাইয়েদের ঘোড়ায় তুলে নিলে। বুড়ী বলেছিল ঘোড়া দিয়ে আসবে একেবারে পৃথিবীর পূর্বভাগে। ছোট এক সাদা মাঠে গিয়ে থামবে। সেখানে তাদের নামতে হবে। আর ঘোড়ার সামনের খুরের তলার ঘাসের চাপড়াটুকু কেটে নিতে হবে। তাই করা হল। ঘাসের চাপড়াটুকু তুলে নিতেই তলায় দেখা গেল ভীষণ উপত্যকা। তলায় নামবার জন্য ঝুড়ি বুনতে ও দড়ি পাকাতে হল। সে কাজ একরকম ছোটই করলে। নামবার বেলায় বড়ো বললে, 'আমি আগে।' কিন্তু খানিকটা নামতেই সে আর নামতে রাজি হল না। তাকে টেনে তোলা হল। তারপর মেজোর পালা। সেও একটু নেমে ফিরে এল। শেষে ছোট গেল। সে পৌঁছল ভীষণ উপত্যকায়। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সে সাত শ যোদ্ধাকে দেখতে পেলে। তাদের সে সেই তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললে। তারপর আর একদল যোদ্ধা। তাদেরও সে সাবাড় করলে। তারপর

সে এল এক ঝরণার ধারে। ঝরণার জল খেয়ে ছোট বিশ্রাম করতে চাইলে। সে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেল। শ্যাম বীরের প্রাসাদ থেকে বন্দিনী নারীর ঝি এসে ঘুমন্ত লনকে দেখে তার মনিবকে জানালে। মহিলা দৌড়ে এল। সে জানত যে এমনি করে ঝরণার ধারেই সে লন দ্যারুরিগের দেখা পাবে। লনকে সে উঠিয়ে নিয়ে প্রাসাদে গেল।

মহিলা লনকে আত্মপরিচয় দিয়ে এই কথা বললে. যে শ্যাম বীর তাকে হরণ করে এনে বিয়ে করতে চাইলে সে সাত বছর একদিনের মুলতুবি কড়ার করিয়ে নিয়েছে। এর পরে সে বিয়ে করবে। তবে ইতিমধ্যে তাকে বীরের পরিচর্যা করতে হবে। বীর পাখি শিকারে যায় তিন দিন ধরে। আর বাড়িতে থাকে তিন দিন ধরে। তার ফেরবার সময় হয়ে এসেছে।

বীর বাড়ি ফিরল। মহিলা তার টেবিলে খাবার দিয়ে এল। খেতে খেতে সে লওনের ব্যাপার সব শুনলে। শুনেই রেগে গিয়ে সে তিনশ যোদ্ধা পাঠালে লওনকে ধরে আনতে। সে তার কলজে যকৃৎ সব উপড়ে খাবে। তাদের সকলের হাতপা কেটে ফেলে স্তূপাকার করলে লওন। তারপর আবার তিনশ করে যোদ্ধা পাঠালে বীর। তাদেরও সব সেই একই দশা হল।

তারপর দুজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। মহিলা লওনকে সাবধান করে দিলে,—'যদি যুদ্ধের ধ্বজদণ্ডে বীর প্রথমে আঘাত করে, তবে সে জিতবে সেদিন। তুমি যদি প্রথমে আঘাত কর তাহলে তুমি জয়ী হতে পারবে,—যদি আমার কথামতো কাজ ক'র। শ্যাম বীর অনেক মায়া জানে। সে যদি বোঝে যে যুদ্ধের গতিক ভালো নয় তখন সে কুয়াশার মতো উবে যাবে। আর সেই ভাবে নেমে এসে তোমাকে আঘাত করবে আর তুমি হয়ে যাবে সবুজ পাথর। সকালে যখন তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে তখন এক প্রস্থ লম্বা ঘাসের চাপড়া তুমি ঈশ্বরের নাম করে কেটে নিয়ে তুমি যে ছোট পাথর প্রথমে দেখবে তার উপর রেখে দিও। যখন বীর তোমাকে আক্রমণ করতে আসবে তখন তুমি সেই চাপড়া দিয়ে বুকের ডান দিকে তাকে মেরো। সে তখুনি সবুজ পাথর হয়ে যাবে।'

তাই হল। লওন মহিলাকে উপরে উঠিয়ে দিলে, মেয়েটিকে দেখে উর (বড়ো ভাই) লুব্ধ হল। সে মনে মনে ভাবলে,—উপরে যে এসেছে সে উপরে থাক আর নীচে যে আছে সে নীচেই থাক। এই বলে লওনকে না তুলে মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। পথে সে একটা মরা ঘোড়ার মুণ্ডু থেকে তিনটে দাঁত খসিয়ে নিয়ে গেল বাবার দাঁত বলে দেখাবে বলে।

এদিকে লওন ঘুরতে ঘুরতে এক বালকের দেখা পেলে,—নাম তার খাটো-কাপড় (খাটো কাপড় পরা, তাই)। তাকে লওন ভীষণ উপত্যকা থেকে বেরোবার পথ জিজ্ঞাসা করলে সে উদ্ধতভাবে উত্তর করলে। তখন লওন তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তাকে শায়েস্তা করলে।

সে উপর দেখিয়ে দিলে, বললে, 'ওই যে লাগামটা আছে ওটাকে নাড়ালেই যে জন্তু আসবে তার মুখে লাগিয়ে দিয়ো। সে তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবে।' লাগামে নাড়া দিতেই একটা ছোট নোংরা ঘোড়ার ছানা হাজির হল। তাতে চড়ে লওন দেশে ফিরে এল।

সে রাজবাড়িতে গেল না। গেল এক তাঁতির বাড়িতে। সেখানে সে শুনলে যে রাজার বড়ো ছেলের বিয়ে, তাঁতিদের রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন। সেও তাঁতিদের সঙ্গে গেল আর তাদের অনেক খাবার দেওয়ালে। তাই শুনে বড়ো ভাই বেরিয়ে এল তাকে তাড়িয়ে দিতে, কেননা সে অত খাবার বিলোচ্ছে। তার সঙ্গে মেয়েটিও বেরিয়ে এল, সে লওনকে চিনতে পারলে না। তখন লওন কৌশলে তার কাছে তার দেওয়া আংটি পৌঁছে দিতে সে লওনকে

চিনতে পারলো। লওন বাপের দাঁত শ্যাম বীরের পকেটে পেয়ে তা নিয়ে এসেছিল। এখন বাপের মুখে পরিয়ে দিতেই মাড়ির সঙ্গে জোড় লেগে গেল। লওনের সঙ্গে মহিলার বিবাহ সকলে স্বীকার করে নিলে।

তারপর পুত্রবধূ অর্থাৎ লওনের পত্নী তার শাশুড়ীকে উপহার দিলে একটি কোমরবন্ধ। বললে, 'এখন আপনাকে পরতে হবে।' রানী তা পরলে। তারপর বৌ শাশুড়ীকে প্রশ্ন করলে, 'উর কার বেটা ?' রানী উত্তর দিলে, 'কেন, উর এরিনের রাজার বেটা।' শুনে বৌ কোমরবন্ধকে বললে, 'কসে এঁটে ধরো'। কোমরবন্ধের আঁটুনিতে রানী মারা পড়বার যোগাড় হল। রানী স্বীকার করতে বাধ্য হল যে উর শুয়র চরায় সে তার বেটা। তারপর প্রশ্ন হল, 'লওন কার বেটা ?' রানী বললে 'রাজার বেটা।' বৌ কোমরবন্ধকে কসে ধরতে বললে—কিন্তু কোমরবন্ধ তেমনই রইল। আঁট হল না। রাজা তখন লওনকে পুত্র বলে স্বীকার করে তাকে অর্ধরাজ্য দান করলে আর উর ও আর্থারকে লওনের চাকর করে দিলে।

গল্পটিতে রামকথার ছায়া নজরে পড়বার মতো নয়। তবে মিল কিছু কিছু আছে। সে মিল আকস্মিক হতে পারে। উৎসগতও হতে পারে। সে মিল পাই কোন কোন চরিত্রের গঠনে। নায়ক যিনি তিনি রামকথার রাম নন, লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের প্রাবল্য ও প্রাধান্য জৈন রামকথায় লক্ষ্য করা যায়। যতদূর মনে হয় তাতে বোধ হয় খোটানী ভাষায় প্রাপ্ত এক কাহিনীতে সীতাকে নিয়ে রামলক্ষ্মণের বিরোধের কথা আছে। মনে হচ্ছে সে কাহিনীতে রাবণ আর লক্ষ্মণ যেন এক হয়ে গেছে। রামকথার যে প্রাচীন রূপটিতে 'লক্ষ্মণ' নামটি (মানে ভাগ্যবান, সুতরাং শ্রীর অধিকারী) গৃহীত হয়েছিল সে কাহিনীতে এই আইরিশ গল্পের মতো রাজার কনিষ্ঠ পুত্রই ছিল নায়ক। ভারতবর্ষীয় রামকথায় রামলক্ষ্মণের দ্বন্দ্বের কথা মুছে ফেলে তাদের সৌভ্রাত্র্যকেই উজ্জ্বল করে দেখানো হয়েছে। যবদ্বীপীয় রামকথায় লক্ষ্মণ বড়ো ভাই।

প্রতিনায়ক শ্যাম বীর (Green Knight) গল্পের শুরুতে যেন পরশুরামের মতো আচরণ করেছে। খোটানী রামকথা কাব্যে দশরথের মৃত্যু ঘটেছিল— পরশুরামের হাতে। এ গল্পে ঘটেছে দারুণ লাঞ্ছনা। তারপর তার আচরণ ঝড়-দানবের মতো। বেদে সীতাকে পর্জন্য-পত্নী বলা হয়েছে। সে কথা আগে আলোচনা করেছি। গল্পের শ্যাম মহাবীর বেদের পর্জন্য (বায়ু ও বাত) দেবতা অসুর (অর্থাৎ দানব) রূপে প্রতিফলিত। পর্জন্য পৃথিবীকে শস্য-শ্যাম করে দেয় তাই মহাবীরকে নাম করা হয়েছে শ্যাম বা সবুজ বলে। ঘাসের চাপড়া যেন দেবতার প্রতীক এবং তুক্। তাই এর আঘাতেই দানব মারা পড়ল (অথবা বশীভূত হল)। কোথাও মহাবীরের আকৃতির বর্ণনা নেই, তার প্রচণ্ডতার ও উদ্দামতার উল্লেখ আছে। এও বেদে পর্জন্য-বায়ুর উল্লেখের মতো (যেমন, একজনের বেগ অনুভব করা যায়, রূপ দেখা যায় না। ঋগেদ ১,১৬৪-৪৪) মহাবীরের বিক্রম ভয়ঙ্কর, বেদে বলেছে—"বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।"

লওনকে ধরে বা মেরে নিয়ে আসতে বীর বার বার যোদ্ধা পাঠিয়েছিল। বেদে বলেছে, – পর্জন্য তাঁর দূতদের পাঠিয়ে দেন। মহাবীরের ভয়ঙ্কর উপত্যকায় পৌঁছতে লওনকে নামতে হয়েছিল ঝুড়ি (basket) করে ঝুলে। বেদে পর্জন্যের দান নেমে আসে মশকক উল্টে। গল্পে মহাবীর বুড়ীর মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল। সে মেয়ে তখন খোলা জানলার ধারে বসে সেলাই করছিল ; ঋগ্বেদে বায়ুর সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—

তুভ্যম্ উষাসঃ শুচয়পরাবতি
ভদ্রা বস্ত্রা তন্বতে দংসু রশ্মিষু

(অর্থাৎ, দূরদেশে দীপ্ত উষারা শোভন বিচিত্র কাপড় বুনে নতুন চমৎকার সুতো দিয়ে)

নায়িকা মেয়েটির সঙ্গে উষার মিল দেখা গেল। এ মিল আরও স্পষ্ট হয় লওনের সম্পর্কে। (গল্পটির আদিম রূপে মেজ ভাই কোন ছিল না। প্রচলিত অন্য এক ধরণের গল্পের সঙ্গে মিল করতে গিয়েই মেজো ভাইয়ের কল্পনা করতে হয়েছে। আসলে কাহিনীর মধ্যে মেজো ভাইয়ের কাজ কিছু নেই।)

উর লওন ও মেয়েটি, রাম লক্ষ্মণ ও সীতার মতোই, দুভাই অশ্বী, নাসত্য ও দস্র, এবং উষার প্রতিচ্ছবি। নাসত্য হল উর, দস্র হল—লওন, বুড়ী হল দেবমাতা বেদে অদিতি—উষার মা। খাটো-কাপড় ছোকরার সঙ্গে রামকথার বানরের মিল খুবই স্পষ্ট। হনুমান যেমন সীতার সন্ধান এনেছিল,—এও তেমনি ভয়ঙ্কর উপত্যকা থেকে লওনের নির্গমনের উপায় দেখিয়ে দিয়েছিল।

অঙ্গুরীবিনিময় ঘটনাটিও রামকথা মনে পড়ায়। এক রামকথা জাতকে পাই যে কৌশল্যার মৃত্যুর পরে দশরথ তাঁর এক বিলাস-সঙ্গিনীকে মহিষী করেছিলেন। এই গল্পের রানীর মধ্যে কৌশল্যা ও বিলাস-সঙ্গিনী মিলে গেছে।

রামকথায় সতীত্ব পরীক্ষা হয়েছিল—বধূর, এ গল্পে—হয়েছে শাশুড়ীর।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হয় যে গল্পটিতে রামকথার ভ্রূণাবস্থার ছাঁচ্ মিলেছে। তা যদি হয় তবে এটি রামকথার প্রাক্-ইতিহাসের প্রথম সাক্ষী।

দ্বিতীয় রুশ গল্পটিতে সীতাহরণ থেকে সীতা পরিত্যাগ পর্যন্ত রামকথার প্রতিবিম্ব আছে। এতে নায়ক রাজপুত্র নয়, সাধারণ সৈনিক যুবক। তবে নায়িকা রাজকুমারী বটে। গল্পটির নাম—দৈব বনফল ('The Magic Berries')।

রাজা, রানী ও তাদের সুন্দরী কন্যা। একদিন ঘাটে এক জাহাজ এসে লাগল। ধনী কোন বণিক এসেছে বাণিজ্য করতে। তার জাহাজের ঐশ্বর্য দেখে লোকের তাক্ লেগে গেল, —সকলে ছুটল জাহাজ দেখতে। রাজকন্যাও জেদ ধরল—যাবে বলে। সেও গেল। তাকে দেখে বণিক জাহাজে আহ্বান করে আনলে—ভিতরের ঐশ্বর্য দেখাতে। রাজকুমারী জাহাজে পা দিতেই তাকে এক কামরায় পুরে জাহাজ ছেড়ে দিলে। তর্ তর্ করে জাহাজ চোখের বাইরে চলে গেল।

বণিক মানুষ নয়, সে দানব। তার নাম নেমাল চেলোভেক্ (Nemal Chelovck) অর্থাৎ হেঁড়ে মানুষ। দক্ষিণ সমুদ্রে তার জাহাজ রাজকুমারীকে নিয়ে পৌঁছে গেল তার রাজ্যে। সে তার ভাগ্নে বা ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে রাজকন্যাকে হরণ করে এনেছিল। তার ভাগনে বা ভাইপো ড্রাগন গোরিনিচ (Dragon Gorinich)। নেমাল চেলোভেক ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এবং প্রায় অমর। তার মরণ নির্ধারিত ছিল 'আপনি-কাটা' তলোয়ারে (Samorek)।

হারানো মেয়ের জন্য রাজা খুব খোঁজাখুঁজি চালাতে লাগলেন। কিন্তু কোন খোঁজ মেলে না। এক ছোকরা সৈনিক একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজার বাগানে এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেলে তার মাথার উপরে দুটো কাক মানুষের মতো কথাবার্তা কইছে। সে কান পেতে শুনলে যে তারা বলাবলি করছে রাজকন্যা-হরণের কথা।

তাদের কথা থেকে সে বুঝতে পারলে, কে রাজকন্যাকে হরণ করে কোথায় রেখেছে আর কি উপায়ে তাকে উদ্ধার করা যেতে পারে। পরের দিন সে রাজার কাছে এসে বললে, সে রাজকুমারীর খোঁজ আনবে। রাজা প্রথমে তার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে মেনে নিয়ে সব যোগাড় যন্ত্র করে দিলেন। যুবক সৈনিকের নাম ইভান (Ivan)। সে জাহাজে করে বেরোল রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে।

কাকেদের কথা অনুসারে ইভানের জাহাজ গিয়ে পড়ল সমুদ্রে, তারপর ভিড়ল সমুদ্র মধ্যে একটি ছোট দ্বীপে। সে দ্বীপে নামল। একটু গিয়ে জানতে পারলে যে দুজন বুনো ভূত পৈতৃক তলোয়ারের অধিকার নিয়ে দীর্ঘকাল তিরিশ বছর ধরে মারামারি করছে। ইভান গিয়ে তাদের মধ্যস্থ হল। সে ঠিক করে দিলে তারা দুজনে তীর ছুঁড়বে এবং যে তীর আগে কুড়িয়ে আনতে পারবে সে ঐ তলোয়ার পাবে। তারা (ভূত) তাই করলে এবং ছুটল তীর কুড়োতে। এই অবসরে ইভান তলোয়ারটি হস্তগত করে জাহাজে উঠে পলায়ন করলে।

তারপর জাহাজ এসে ঠেকল নেমাল চেলোভেকের দ্বীপে। সে দ্বীপে কোন রক্ষীবাহিনী রাখবার প্রয়োজন হয়নি। ইভান সহজেই রাজকন্যার সাক্ষাৎ পেলে। দুজনে বিবাহ-প্রতিজ্ঞা করলে। রাজকন্যা তার আংটি ইভানকে দিলে। এমন সময়ে মানুষের গন্ধ পেয়ে নেমাল চেলোভেক হুড়মুড় করে এসে পড়ল। ইভান সহজেই সেই তলোয়ার দিয়ে তার মুণ্ডু কেটে ফেললে। কাটা মুণ্ডু কাঁধে পড়ে জুড়ে যাবার উপক্রম করতে ইভান মুণ্ডুটাকে দূরে ছুঁড়ে দিলে। নেমাল চেলোভেক তখন মারা পড়ল। রাজকন্যাকে নিয়ে ইভান দেশে ফিরল।

রাজকন্যা ইভানকে বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু দেশে ফিরে তার মত বদলে গেল। তার পিতারও মত ছিল না। মেয়ের জন্য বাপ যে রাজাকে বর ঠিক করেছিল রাজকন্যা তার দিকেই ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু ইভানের সঙ্গে বিয়ে ঠেকান গেল না। রাজকন্যা পাণিপ্রার্থী রাজার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বামীকে (ইভানকে) ভুলিয়ে তার 'আপনি কাটা' তলোয়ার লুকিয়ে রেখে দিলে। তারপর সেই রাজা এসে যুদ্ধ করে ইভানকে হারিয়ে দিলে। ইভান রণক্ষেত্রে মৃত বলে পরিত্যক্ত হল।

সে কিন্তু মরেনি। সুস্থ হয়ে সে অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে গিয়ে এক জঙ্গলে লুকিয়ে রইল। দিনের বেলা খিদের চোটে হলুদ-রাঙা দুটি বন-ফল খেলে। তাতে তার মাথায় দুটো শিঙ্ গজিয়ে গেল। তার মহা ভাবনা হল সে লোকালয়ে মুখ দেখাবে কি করে। বনে ঘুরতে ঘুরতে তার আবার খিদে পেলে - তখন সে হলদে বন-ফল না খেয়ে লালরঙ্ বন-ফল দেখতে পেয়ে তাই দুটি খেলে। খেতেই তার শিঙ দুটি খসে পড়ল।

তারপরের দিন সে ডালায় হলদে বন-ফল সাজিয়ে নিয়ে শহরে বিক্রি করতে এলো ছদ্মবেশ ধরে। রাজকন্যা প্রাসাদের জানালা থেকে দেখে তাকে ডেকে এনে ফল কিনে নিলে ও খেলে। ফল দুটি খেতেই তার মাথায় শিঙ্ গজিয়ে গেল। খোঁজ খোঁজ ফলওয়ালাকে। সে ততক্ষণে অন্তর্ধান করেছে। তখন রাজকন্যার শিঙ খসাবার জন্য ওঝা বদ্যিদের ডাকা হল। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলে না। কিছুদিন পরে ইভান অন্যরকম ছদ্মবেশ করে হাতের থলিতে দুটি লাল ফল নিয়ে রাজার কাছে এসে বললে যে সে রাজকন্যার মাথা থেকে শিঙ্ খসিয়ে দিতে পারে। তবে তার শর্ত হল এই যে, সে আর রাজকন্যা ছাড়া ঘরে কেউই থাকবে না। আর রাজকন্যা যতই চীৎকার কান্নাকাটি করুক কেউই সে ঘরে ঢুকবে না। যখন সে আসতে বলবে তখনই লোকে ঘরে ঢুকবে। তাই হল।

নির্জন ঘরে ইভান আত্মপরিচয় দিয়ে পত্নীকে খুব ভৎসনা ও নিপীড়ন করলে আর তার কাছ থেকে তলোয়ার আদায় করে নিলে। তারপর লাল বন-ফল দুটি খাইয়ে তার শিঙ্ খসিয়ে দিলে।

তারপর ইভান যুদ্ধ করে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিহত করলে আর অবিশ্বাসিনী পত্নীকে ও তার পিতা-মাতাকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজত্ব করতে লাগল।

গল্পটির নায়ক রামের মতো রাজপুত্র নয়। তবে তেমনি ধনুর্ধর। নায়িকা সীতার মতো রাজকন্যা তবে অপহরণের পূর্বে তার বিয়ে হয়নি। বুনো ভূত দুজনকে বালী ও সুগ্রীবের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অপহৃত নায়িকাকে রাখা হয়েছিল লংকার মতোই দ্বীপে। প্রতিনায়ক রাবণের মতো রাক্ষস। তার কাটা মুণ্ডু যে জোড়া লেগে যেত তা দশগ্রীব রাবণকেই স্মরণ করায়। নায়ক ও নায়িকার মাথায় শিঙ্ গজান ব্যাপারটা সীতার হরিণী রূপের ইঙ্গিত করে। নায়িকার নির্বাসনে সীতা পরিত্যাগের ইঙ্গিত।

অতঃপর একটি আনাতোলীয় (বা তুর্কি অথবা হাঙ্গেরীয়) গল্প বলছি যার অসাধারণ বিশেষত্বের জন্য বলা যায়—গল্পটি আসলে প্রত্ন-আনাতোলীয় রামায়ণ। নাম 'শাহ মেরাম্ ও সাদে সুলতান।' (অর্থাৎ 'রাজা মেরাম ও সাদে রানী)। নাম দুটির মধ্যে রাম ও সীতা নামের অভ্রান্ত ধ্বনি আছে। মহীরাম ও সীতা ?

এক বাদশার তিন পুত্র। বাদশা মরে গেলে পর কে রাজা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য ছেলেরা তীর ছোড়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে। যার তীর সব চেয়ে দূরে পড়বে সেই বাদশা হবে। বড়ো দুছেলের তীর পাওয়া গেল। ছোট ছেলের তীর পাওয়া গেল না। তীর খুঁজতে খুঁজতে তিন ভাই পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে ছোট ভাই এসে পড়ল এক রাজবাড়ির কাছে। বাইরে পাঁচিলের কাছে চল্লিশজন দস্যু জটলা করছিল কি করে পাঁচিল ডিঙোবে বলে। ছোট ভাই তাদের সাহায্য করবার ছলে একে একে সবাইকে কেটে ফেললে। প্রাসাদে ঢুকে তিন ঘরে তিন সুন্দর মেয়ে ঘুমিয়ে আছে দেখলে। ছোট মেয়েটির কপাটে সে ছোরা গেঁথে রেখে বাড়ি চলে এল। সবই ঘটল রাতারাতি। সকালে উঠে বাদশা দেখে শুনে ঢ্যাড়া পিটোলে এই মর্মে, যে দরজার কপাটে গাঁথা ছোরাটি খসাতে পারবে তারই সাথে ছোট মেয়েটির বিয়ে দেবে।

তিন ভাই এল। ছোট ভাই নিজের ছোরা খসিয়ে নিলে। তিন ভাইয়ের সাথে তিন বাদশা কন্যার বিয়ে হল। তিন জনে বউ নিয়ে বাড়িমুখো হল। এক দানব এসে ছোট ভাইয়ের কাছ হতে তার বউকে ছিনিয়ে নিল। এই দানবের অনুচর ছিল সেই চল্লিশজন যাদের ছোট ভাই কেটে ফেলেছিল। তারা গিয়েছিল মেয়েটিকে হরণ করতে। ভাইদের ঘর যেতে বলে ছোট চলল পত্নীর খোঁজে। কিছুদূর গিয়ে এক দানব-বুড়ীর দেখা পেলে। সে হল ঐ দানবের মা। বুড়ীকে মা বলে ডাকতেই সে বুড়ী গলে গেল। তার কথা শুনে সে বললে তার মেজো বোনের কাছে যেতে। মেজো বোনের কাছে গেলে সে বললে তার বড়ো বোনের কাছে যেতে। তার কথা শুনে দানব-বুড়ীর বড়ো বোন তাকে নির্দেশ দিলে সমুদ্রতীরে একটা বিশেষ স্থানে গিয়ে সেখানে চল্লিশদিন অপেক্ষা করে থাকতে। সেই সময়ের মধ্যে একটা দিনে সিন্ধুঘোটকের (Sea horse) ছানারা ডাঙ্গায় উঠে। সে যেন পশমের সুতোনুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর একটা ছানা সেই সুতো দিয়ে ধরে নিয়ে আসে। সে তাই করলে। বুড়ী সিন্ধুঘোটকের ছানাকে চল্লিশদিন ধরে খাওয়ালে আর শিক্ষা দিলে। তারপরে বললে সেই

ঘোড়ায় চড়ে দানবের প্রাসাদে গিয়ে তার বউকে উদ্ধার করে আনতে। ছোট ভাই বউকে উদ্ধার করে বুড়ীর বাড়ি নিয়ে এল। বুড়ী বললে,—'এইবার বাড়ি যাও, তবে এক কাজ তাদের নিয়ম মাফিক করতে হবে, রোজ তাকে একটি করে মানুষ যোগাতে হবে। ব্যতিক্রম হলে সে গিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীকে গিলে ফেলবে।' রাজি হয়ে ছোট ভাই ঘরমুখো হল।

একদিন দানব-বুড়ীকে মানুষ পাঠাতে ভুল হয়ে গেল। বুড়ী এসে তাদের ধরে নিয়ে গেল। অনেক কষ্টে বুড়ীর হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে তারা ঘরে ফিরছিল, পথে এক স্থানে তারা বিশ্রাম করতে থামে। পত্নীর কোলে মাথা দিয়ে ছোট বাদশাজাদা ঘুমচ্ছে – এমন সময় দানব এসে মেয়েটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। বিকট চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল সে চীৎকার আসছে অনতিদূরে এক কুয়ার ভিতর থেকে। একটু পরে কুয়ার মধ্যে থেকে এক পাখি উড়ে এল। সে পাখি তাকে পরীদের বাদশার কাছে নিয়ে গেল। পরীদের বাদশা বললে,—'যেখানে চাও পাখি তোমাদের নিয়ে যাবে। যদি তোমার কোন সংকট ঘটে তখন তুমি 'আমার শাহ' বলে ডেকো, আমি তোমাকে উদ্ধার করব।' পাখির পিঠে চড়ে সে উড়ে গিয়ে পত্নীকে উদ্ধার করল। দানব ধাওয়া করেও তাদের নাগাল পেলে না। তারা পাখির পিঠে চড়ে পরীদের বাদশার কাছে এল। পরীদের বাদশা বললে,—'আজ থেকে তোমাদের দুজনের নাম হল – 'শাহ মেরাম ও সাদে সুলতান।' তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। তবে খবরদার, ভুলেও তোমাদের পুরোন নাম আর উচ্চারণ ক'র না।' তারা বাড়ি ফিরে আনন্দ-উৎসব লাগালে।

উৎসব শেষ হয়ে গেলে একদিন রাত্রিতে যখন দুজনে ঘুমোচ্ছে তখন দানব হানা দিয়েছিল। মেয়েটি 'শাহ মেরাম' বলে ডেকে ওঠায় দানব অমনি পাষাণে পরিণত হয়।

তাকে বাগানে রাখা হল জলাশয়ের ধারে। একদিন তারা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ভুল করে নিজেদের পুরোন নামে ডেকে ফেলে আর অমনি পাথর ফেটে দানব বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করে। তখুনি নতুন নাম ডাকায় পাথর যেমন ছিল তেমনি হয়ে যায়।

অনেকদিন পরে মেয়েটি স্বপ্নে দেখলে যে এক দরবেশ এসে তাকে বলছে যে তারা যদি কখনো নিজেদের নাম (নতুন নাম) ভুলে যায় আর দৈত্য সুযোগ পেয়ে পাথর ফেটে বেরিয়ে আসে তখন তারা যেন জলাশয় থেকে জল নিয়ে পাথরের মূর্তির মাথায় ছিটিয়ে দেয়। তাহলে তার থেকে সোনা ও মানিক ঝরবে আর তাদের কখনো দানবের ভয় থাকবে না।

একদিন তাদের নামের ভুলে দানবের আবির্ভাব হল। বাদশাজাদা তাকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ করলে তার পত্নী 'সাদে সুলতান' বলে ডেকে উঠল। অমনি দানব পাষাণে পরিণত হয়ে জলাশয়ে পড়ে গেল। আর জল সেই থেকে তার রক্তে রাঙা হয়ে গেল। পরে একদিন দরবেশ দেখা দিয়ে জানিয়ে দিলে সে তার কথা অনুসারে ঠিকমতো কাজ না করাতেই তারা পাষাণ মূর্তি থেকে সোনা মানিকের স্বর্ণধারা আর পেলে না। দরবেশ চলে যাবার পর সে বাগানে যাওয়া আসা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল।

এ গল্পটিতেও রাজার তিন ছেলে, তবে মেয়ের উল্লেখ নেই। সাহায্যকারী হল পরীদের রাজা ও তার অনুচর পাখি। নায়ক ছোট ভাই। তিন ভাই বিয়ে করেছে, তিন বোনকে, যেমন রামায়ণে। পরীক্ষা তীর ছোঁড়ায় ও বাহুবলে। প্রতিনায়ক আসলে ঝড়-দানব। ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা প্রায় রাবণের কাজেরই মতো। দানবের দুর্গ রসাতলে।

॥ ৮ ॥

তৃতীয় কথার বিষয় প্রথম কথার মতোই সঙ্কীর্ণ। এক রাজার পত্নী বিনা দোষে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি সসত্ত্বা ছিলেন। আশ্রয় পান এক মুনির কুটীরে। সেইখানেই দুটি পুত্রের জন্ম দেন। মুনির কাছে শিক্ষা পেয়ে ছেলে দুটি ওস্তাদ গায়ক হয়। তাদের গান শুনে রাজা খুশি হয়ে তাদের পরিচয় জেনে তাদের পুত্র ব'লে গ্রহণ করেন। পত্নী অভিমানে দেহত্যাগ করেছিলেন।

কথার নায়ক মুনি যিনি বিজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

এ গল্পের উড়ো বীজ বেশি মেলেনি। কিন্তু যে দু একটি মিলেছে তাতে এ গল্পের মূল যে খুব পুরোনো তা বলতে হয়।

প্রথমে আইরিশ সাগার গল্পটি বলি।[১] —'ওইসিনের মা'।

একদিন বীর ফিন্‌ন্‌ দুটি পোষা কুকুর নিয়ে শিকার করতে গিয়ে এক অপূর্ব মৃগী দেখতে পায়। তাড়া করায় সে হরিণী এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে শেষে ফিন্‌নেরই দুর্গে ঢুকে পড়ে। ফিন্‌ন্‌ তা জানতে পারে নি। রাত্রিবেলায় হরিণী খুব সুন্দরী নারী হয়ে ফিন্‌নের কাছে এসে নিজের পরিচয় দেয়। তার নাম সাবা (Sava), পরীদের মেয়ে। এক কালো দ্রুইদ[২] তাকে বিয়ে করতে চায়। সে রাজি না হওয়াতে তাকে মন্ত্রবলে হরিণী করে দিয়েছে। দ্রুইদের এক শিষ্য তাকে বলে দিয়েছিল যে ফিন্‌নের বাড়ি ঢুকলে সে আবার তার পূর্বরূপ ফিরে পাবে। তিন বছর ধরে সে পশুরূপ ধরে আছে।

ফিন্‌ন্‌ তাকে আশ্রয় দিলে তার পরে তাকে বিয়ে করলে। তার পর তাকে একদিন যুদ্ধ করতে চলে যেতে হয় দুর্গ ছেড়ে। যাবার আগে ফিন্‌ন্‌ মানা করে দিলে সাবাকে সে যেন তার স্বামীর অনুপস্থিতিকালে দুর্গের বাইরে পা না বাড়ায়। কিন্তু দ্রুইদ তক্কে তক্কে ছিল। ফিন্‌ন্‌ যাবার দুচার দিন পরেই সে ফিন্‌নের মূর্তি ধরে তার মতো দুটো কালো কুকুর নিয়ে দুর্গের অদূরে দেখা দিলে। তাকে দেখে ফিন্‌ন্‌ ফিরে এসেছে মনে করে সাবা আনন্দে ছুটে বেরিয়ে যায় দুর্গ থেকে তাকে স্বাগত জানাতে। তখন দ্রুইদ কবলে পেয়ে তাকে আবার হরিণী করে নিয়ে চলে যায়। ফিন্‌নের লোকজন সন্ধান করেও কিছু করতে পারলে না।

যুদ্ধ জয় করে ফিন্‌ন্‌ ফিরে এল। সাবার বৃত্তান্ত শুনে সে খুব কাতর হয়ে পড়ল। তারপর সে নিজে সাবার অনুসন্ধান করতে লাগল। অনুসন্ধানে সাত বছর কেটে গেল। তখন সে সাবার আশা ত্যাগ করে আগেকার মতো মৃগয়া করে দিন কাটাতে লাগল। একদিন সে শিকারে গিয়ে এক গুহার কাছে একটি সুন্দর বালক দেখতে পেলে। তার কুকুর দুটি দৌড়ে গিয়ে ছেলেটির গা চাটতে লাগল। ফিন্‌ন্‌ ছেলেটিকে বাড়ি নিয়ে এল। তাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে লাগল। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা হল, তার মা-বাবা কে তা-সে জানে না। জানে এইটুকু মাত্র যে তাকে পালন করত সে এক হরিণী। মাঝে মাঝে একটা কালো লোক এসে হরিণীকে মারধর করত। শেষবারে এসে সে হরিণীর সঙ্গে অনেক

১. Irish Sagas and Folk-tales, translated by Eileen O' Faolin, Oxford University Press.

২। মন্ত্রবিদ্ মায়াবী ও সঙ্গীতজ্ঞ মুনি।

বকাবকি করে তারপর একটা কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে মেরে তাকে জোর করে কোথায় গেছে। যাবার সময় হরিণী বারবার পিছু ফিরে তার দিকে চাইছিল। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে। জেগে উঠে সে দেখে যে সে অন্য এক পাহাড় গুহায় রয়েছে। তারপর ফিন্নের সঙ্গে তার দেখা।

ছেলেটিকে ফিন্ন্ নিজের বলে গ্রহণ করলে। তার নাম রাখলে 'ওইসিন' (Oisin, মানে বৃষ)। পরে সে ফিন্নদের মধ্যে বড়ো বীর বলে গণ্য হয়েছিল। কবি অর্থাৎ গায়ক-কথক রূপেও তার খুব নাম হয়েছিল।

এই গল্পটির সঙ্গে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের গল্পের যোগ চট করে নজরে না পড়লেও গভীর বটে। রাম পত্নীকে হারিয়েছিলেন তবে পুত্র পেয়েছিলেন। পুত্রদ্বয় সঙ্গীতদক্ষ ছিল এবং পরবর্তীকালে বীর বলে গণ্য হয়েছিল। দ্রুইদ-হরিণী ব্যাপারটি দ্বিতীয় কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রাম কোন মন্ত্রসিদ্ধ মুনির কন্যার মনোহরণ করে বিবাহ করেছিলেন। আইরিশ গল্পের সাবার সঙ্গে ফিন্নের সম্পর্কও সেইরূপ। আর সাবার হরিণী হওয়া ব্যাপারটি আর একটি পুরোনো উড়ো বীজ যা বৈদিক গদ্য গ্রন্থে[১] মিলেছে। সে গল্পটুকু এই,

প্রজাপতি (মানে জীব-সৃষ্টিকর্তা) নিজের কন্যার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। প্রজাপতি ধরেন মৃগ রূপ আর তার কন্যা ধরেন মৃগী রূপ। দেবতারা দেখতে পেলেন যে প্রজাপতি অনুচিত কর্মে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে এমন কাউকে পেলেন না যিনি প্রজাপতিকে দমন করতে সমর্থ। তখন তাঁরা করলেন কি, নিজেদের মধ্যে যাঁরা ভীষণ ছিলেন তাঁদের একত্র সমাবেশ করলেন। সেই দেবতারা সমাধিষ্ট হয়ে এক নূতন দেবতা হলেন। তাঁর নাম হল ভূতবান্।[২] ভূতবান্‌কে দেবতারা বললেন অনুচিত কর্মকারী প্রজাপতিকে বাণে বিদ্ধ করতে। তিনি রাজি হলেন এই সর্তে যে তাঁকে পশুদের আধিপত্য দিতে হবে। তিনি তখন গিয়ে প্রজাপতিকে শরবিদ্ধ করলেন। সেই থেকে প্রজাপতিকে বলা হয় মৃগ আর তাঁর কন্যাকে বলা হয় লাল গাই (বা লাল ঘোড়া)।[৩]

দ্বিতীয় মূল কাহিনীর সঙ্গে এ গল্পটির বেশ মিল আছে। রামকথায় মারীচ কর্তৃক অপহরণ ব্যাপারে কালপুরুষ মৃগশিরা নক্ষত্রের মোটিফের মিল আছে।

আইরিশ গল্পের ওইসিন হল কুশীলব (অর্থাৎ কুশ ও লব একত্র)।

॥ ৯ ॥

রামকথার একটি অদ্ভুত রকম উড়ো বীজ মিলেছে হোদের উপকথায়। উড়ো বীজটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তৃতীয় আখ্যানের সঙ্গে। তবে নায়ক রাম নন, রাবণ। আর রাবণ এখানে

১। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৩-৩৩।

২। মানে, যে উৎপন্ন হয়েছে। অন্য ব্রাহ্মণে ইনি রুদ্র।

৩। বৈদিক সাহিত্যে গল্পটি মৃগশিরাঃ নক্ষত্রের জন্মকথারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। মহাভারত বনপর্বে বিস্তৃত রামকথায় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে এই নক্ষত্রের উপমাই দেওয়া হয়েছে।

'অন্বধাবন্ মৃগং রামো রুদ্রস্তারাগণং যথা ॥ ২৭৮-২০ ॥

রামশত্রু নয় বৈদিক গল্পের প্রজাপতির রূপান্তর। সেই সঙ্গে যোগ আছে রাবণের এবং রামের। এখন গল্পটি বলি। এটি সংগ্রহ করেছিলেন বোম্পাস।[১]

এক ছিল রাজা। সে রোজ নাইতে, মুখ ধুতে যেত একটা পুকুরে। সে পুকুরে একটা বড়ো মাছ ছিল। সে মাছটা রাজার মুখ ধোয়া কুলকুচো থেকে খাদ্যকণা খেত। তার ফলে তার গর্ভ হল। যথাকালে মাছটা প্রসব করলে দুটি মানুষের ছেলে। ছেলে দুটি বড়ো হলে পর পুকুরের পাড়ে উঠে অপর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করত। একদিন একটা লোক অপরিচিত সুন্দর ছেলে দুটিকে দেখে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তারা বাপের নাম জানে না, তাই কিছু বলতে পারলে না। তখন ছেলে দুটিকে সে বেজন্মা ভেবে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করবার অনুপযুক্ত বলে মারধর করে তাদের তাড়িয়ে দিলে। মাছ-মায়ের কাছে গিয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বললে আর জানতে চাইলে তাদের বাবা আছে কিনা। মাছ তখন তাদের বাপের নাম বলে দিলে - রাবণ রাজা।

তারপর দুই ভাই বেরোল বাপের খোঁজে। অনেক দূর গিয়ে একটা লোক দেখতে পেয়ে তাকে রাবণ রাজার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে। তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লোকটা তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। তারা বললে, আমরা রাবণ রাজার ছেলে। রাবণ রাজা ছিল লোকটার দেশের শত্রু। তাই সে ছেলে দুটির কথা শুনে শত্রুর ছেলে বলে কেটে ফেললে। ওদের দেহ যেখানে পড়ে রইল সেখানে গজিয়ে উঠল দুটো বাঁশ গাছ। গাছ দুটো যখন মোটা হয়েছে তখন কোথা থেকে এক যোগী এসে সে বাঁশ গাছ দুটো কেটে নিয়ে গেল। তার থেকে সে দুটো বাঁশি তৈরি করলে। সে বাঁশিতে চমৎকার সুরে গান বেরোত। যে শুনত সেই আশ্চর্য হয়ে যেত। বাঁশি-বাজিয়ে যোগী ঘুরতে ঘুরতে রাবণ রাজার দেশে এল। রাজার কানে তার খবর গেল। রাজা যোগীকে ডেকে পাঠালে। বাঁশি নিয়ে যোগী রাজার সামনে আসতেই বাঁশির মধ্যে থেকে ছেলে দুটি বেরিয়ে এল। তাদের মুখে তাদের পরিচয় পেয়ে রাজা তাদের নিজের বলে গ্রহণ করলে। যোগীকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হল।

গল্পটিকে তৃতীয় কাহিনীর সঙ্গে মেলাতে গেলে,—রাবণ = রাম ; মাছ = সীতা ; যোগী = বাল্মীকি ; ছেলে দুটি ও বাঁশি = কুশ ও লব।

আহারের ফলে গর্ভসঞ্চারের ব্যাপার ফিলিপিন রামকথায় আছে।[২] রাম-সীতার জলকেলির ফলে সীতার গর্ভসঞ্চারের উল্লেখ আছে মালয়ের রামকথায়।[৩]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে গল্পটির নায়ক রাম না হয়ে রাবণ হল কেন। ভ্রান্তিবশে রাম-রাবণ নামের বিপর্যয় ঘটেছে,—এ অনুমান খুব টেকসই নয়। রামায়ণ হরিবংশ ইত্যাদিতে রাম-সাগার (saga) মতো রাবণ-সাগাও আছে। দূর অতীত কালে যে এই দুই সাগার মধ্যে কাহিনীর অদল-বদল হয়নি তাই বা কে জোর করে বলবে। সীতা রাবণের কন্যা, সে কন্যায় আসক্ত হয়েছিল, দৈব নানারূপে সে মিলনে বাধা দিয়েছিল—এ গল্প তো বিভিন্ন রাম-কথায় যথেষ্ট মিলেছে। শুধু হোদের গল্পেই নয়, দ্বীপময় ভারতেও রাম-কথা রাবণ-কথা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ফিলিপিন রাম-কথা কাব্যের নাম 'মহারাদিয়া লাওয়ানা' (= মহারাজা রাবণ), মালয়ের একটি প্রসিদ্ধ রাম-কথা রচনার নাম 'হিকায়ৎ মহারাজা রাবণ' (= মহারাজা রাবণের কথা)।'

১. Folk-lore of Santal Parganas, পৃ. ২৩৭-৪০।
২. রাম-কথার প্রাক্‌ইতিহাস পৃ. ১৯ দ্রষ্টব্য।
৩. ঐ পৃ. ২২, ২৩।

এর থেকে অনুমান করতে পারা যায় যে গোড়ার দিকে কোন কোন লৌকিক গল্প বীজে কাহিনী রাবণরাজার গল্প বলেই চলিত ছিল। রাম ছিলেন আগন্তুক রাজপুত্র, অ্যাডভেঞ্চারার। সাগা ছিল আসলে রাবণেরই। রাবণই দুইদ্ বাল্মীকি। রাবণই বৈদিক গল্পের প্রজাপতি।

॥ ১০ ॥

মহাভারত বনপর্বে রামকথার যে বিস্তৃত বর্ণনাটির কথা আগে বলেছি, সেটিকে 'মার্কণ্ডেয় রামায়ণ' বলা যায়। এ কথা মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী হরণের লজ্জায় তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। এ কাহিনীতে উত্তরকাণ্ডের সীতা পরিত্যাগের কাহিনী নেই। কুশ-লবও নেই। বাল্মীকির কোন উল্লেখই নেই।

এ কাহিনীর শেষ শ্লোকের শেষার্ধ মহাভারতে অন্য সব কথাগুলিরই মতো।[১]

তত‍ো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীম্ অনু।
দশাশ্বমেধান্ আজহ্রে জারুথ্যান্ স নিরর্গলান্ ॥ ২৯২-৭০ ॥

'তারপর (রাম) দেবর্ষির সহিত গোমতী নদীর ভাটিতে দশ অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করেছিল —অজস্র ভোজ্য বস্তুর আয়োজন করে॥'

॥ ১১ ॥

এখন রামকথার আলোচনা শেষ করছি রামায়ণ-কাব্যের বিভাগগুলির নামকরণ নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ করে। রামায়ণ ছ কাণ্ডে বিভক্ত,—বাল (আদি), অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিষ্কন্ধা (কিষ্কিন্ধ্যা) ও লঙ্কা (যুদ্ধ)। দুটি ছাড়া সবই স্থান-বাচক। 'বাল' কাণ্ড নামটির কোন ব্যাখ্যার আবশ্যক নেই, কিন্তু 'সুন্দর' কাণ্ডের আছে। তার আগে 'অযোধ্যা' ও 'কিষ্কিন্ধা (কিষ্কিন্ধ্যা)' সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে।

দশরথের রাজধানীর নাম অযোধ্যা। নামটির মানে কী। অথর্ব সংহিতায় 'অযোধ্য' শব্দটি আছে, মানে "যার সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না, অজেয়"। কিন্তু নগরের দুর্গ অথবা রক্ষীর কোন উল্লেখ নেই। তা ছাড়া নামটি ঐতিহাসিকও নয়। ইতিহাসে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এ নগর 'সাকেত' নামেই প্রসিদ্ধ। সুতরাং নামটি রূপকথার হওয়াই সম্ভব। তাহলে অর্থ হবে "যুদ্ধ করবার অনুপযুক্ত, শান্তিপূর্ণ।"

'কিষ্কিন্ধা (কিষ্কিন্ধ্যা)' নামটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এ নামটি বিশুদ্ধ রূপকথার। বালী-সুগ্রীবের স্থান। আমার অনুমান হয় নামটি এসেছে কিস্-কিম্-ধা (ধ্যা) থেকে। মানে, "কে-কাকে-চেনে" বালী-সুগ্রীবের এক চেহারার ইঙ্গিতময়।

'সুন্দর' কাণ্ডের বস্তু অত্যন্ত অসুন্দর,—সীতাহরণ ও রামবিলাপ। এ নামটির ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেন নি। অথচ মানে হাতের কাছেই আছে। 'সুন্দর' এসেছে বৈদিক 'সূনর' থেকে, আবেস্তীয় 'হূনর' প্রাচীন পারসীক 'হূনরা', আধুনিক ফারসী 'হূনুর'। মানে দক্ষ, বিজ্ঞ, সূক্ষ্ম জ্ঞানবান্ ও শক্তিমান্। এই অর্থ বাংলা 'নরসুন্দর' কথাটিতে এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর সুন্দরে পাওয়া যায়। রামায়ণ কাহিনীতেও সূনর—সুন্দর হচ্ছে রাবণ। (বৌদ্ধ সাহিত্যে এক সর্প-দানবের নাম 'সুন্দর'।) এই নামের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে সুন্দরকাণ্ড নামটি কাহিনীর একটি প্রাচীন সূত্র ধরে রেখেছে।

১. রামকথার প্রাক্ ইতিহাস, পৃ. ২৫-৯ দ্রষ্টব্য।

হুতোমের 'মালিক' ও 'লিপিকর'

শ্রীজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান মুদ্রিত সাহিত্যের কীর্তিগুলি ঘটেছে। বিশেষত ৭ম দশকে গদ্যে প্রথমতম অবদান বোধ হয় 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা'। বাংলা সাহিত্যে এ সময়ে সরল গদ্য আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে যার প্রথম ফলশ্রুতি সাধুভাষা ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্ব। 'নক্‌শা' রচনার আগের পটভূমিকা বিচার করা গেলে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'ট্রানজিশন পিরিয়ড' পুরোদমে শুরু হয়েছে। বিশ্বাস আর সংস্কারের সঙ্গে যুক্তির দ্বন্দ্ব সমাজ-প্রথায় বহু বিচিত্র পরিবর্তন ব্যঙ্গ রচনার জন্ম দিয়েছে। এ বিষয়ে গদ্যমুখী পয়ারে ঈশ্বর গুপ্তের সমাজচিত্রণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তকবির সরস কলমে পয়ার সব চেয়ে বেশি গদ্যের ডানায় ভর দিতে শিখেছে।

বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে নক্‌শার ভূমিকা বিচার আজকের লক্ষ্য নয়। একটা মামুলি প্রশ্ন মনে এসেছে। যে-কোনো মুদ্রিত পুস্তক সম্পর্কে প্রথমতম স্বাভাবিক প্রশ্ন হলো রচনাকারের পরিচয়। নক্‌শা-র রচয়িতা কে বা কারা? সমসাময়িক সমাজ-চণ্ডীমণ্ডপের গোষ্ঠিনেতাদের কুৎসিত ব্যভিচারকে উলঙ্গ কলমে তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ করা হয়েছিল নক্‌শায়। স্বাভাবিক ভাবেই লেখক স্বনাম মলাটে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি। এক সমাজপতির ব্যভিচারকে ব্যঙ্গ করার উৎসাহ ও সাহস যোগাতে পারেন আর এক জন ধনী সাহসী সমাজপতি। কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই সর্বদা সেই সমাজপতি স্বয়ং নিজের কলমে এ কীর্তি করবেন। সদ্য প্রচলিত মুদ্রাযন্ত্রের বাজার তখন বটতলা অঞ্চলে। সেই সুবিধা সম্পর্কে মুদ্রালুব্ধ জীবিকা-সন্ধানী লেখকরা অর্থের বিনিময়ে কলম ভাড়া বা পরের নামে রচনা প্রকাশ করে দিতেন। দরিদ্র পিতা যেমন অক্ষমতার দরুন আপন পুত্রকে ধনীর কাছে পোষ্য দান করেন কিছু অর্থের বিনিময়ে। নক্‌শার ক্ষেত্রে ব্যাপারটার পরিণতি দাঁড়িয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 'অগ্রদানী'র ধরনে।

সম্প্রতি একটি বিতর্ক উঠেছে 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা'র প্রকৃত লেখক কে? বিষয়টির আলোচনার জন্য সমসাময়িক পটভূমিকা বিচার করা প্রয়োজন। এত দিন যে নাম অবিসংবাদিত ভাবে প্রচলিত ছিল তা হলো কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'নক্‌শা'র গুরুত্ব দুটি দিকে—সমসাময়িক সমাজচিত্রণে এবং সাহিত্যে তখনও অপ্রচলিত চল্‌তি গদ্যকে আসন দেবার চেষ্টায়।

সমাজচিত্রণের পক্ষে এ ধরনের রচনার যোগ্যতা কালীপ্রসন্ন সিংহের থাকা অস্বাভাবিক নাও হতে পারে। সমসাময়িক সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রেই কালীপ্রসন্ন অন্যতম সমাজপতি। সঙ্গে ছিল প্রথম যৌবনের উত্তেজনায় সাহিত্য-যশ উপার্জনের যুগোপযোগী উন্মাদনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তনশীল সমাজে ধনী পিতৃহীন কিশোর কালীপ্রসন্ন পৈতৃক সূত্রে অগাধ অর্থ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় সূত্রেই তিনি উচ্চ মহলে জ্ঞানীগুণী-সভায় অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছেন স্বচ্ছন্দে। কিন্তু ছ'বছর বয়সে পিতৃহীন ধনী 'সেই হঠাৎ বাবু-যুগের' কুৎসিত ট্রাডিশনকে বিন্দুমাত্র অস্বীকার করতে পারেন নি। নাবালক শিশুর পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ট্রাস্টের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরই পিশেমশাই হরচন্দ্র ঘোষ। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর বিপ্লবী ছাত্র হরচন্দ্র কালীপ্রসন্নকে লেখাপড়ার দিকে নিয়ে যেতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু সেকালের শিক্ষার আনুষঙ্গিক প্রভাব

কালীপ্রসন্ন এড়াতে পারেন নি। স্কুল বালকের বেশ্যা-গমন এ সময়ে একটি যুগোপযোগী রোগ। কলকাতার কয়েকটি স্কুলও এ-সময়ে চিৎপুর, 'বটতলা', সোনাগাছি অঞ্চলে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্রজীবন যে বটতলার বিদ্যালয়ে সেই ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিও এই অঞ্চলে।

যুগোপযোগী আর একটি হিড়িক ছিল সংবাদপত্রে আন্দোলন। ১৮৫৬-৫৭ সাল নাগাদ কালীপ্রসন্ন সিংহও একটি আন্দোলন করেন সোনাগাছি বিস্তৃতিরোধের জন্য। অত্যন্ত সাধু প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে। কালীপ্রসন্নের যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন জনৈকা বাসভ্রষ্টা বারাঙ্গনা চিঠি লিখে জানান তাঁদের অন্যায় কারণে উদ্বাস্তু করা হচ্ছে। কালীপ্রসন্ন তখন সংবাদপত্রে নীরব। হঠাৎ কালীপ্রসন্নের যখন সতেরো বছর বয়স তখন সংবাদ প্রভাকরে এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় বেশ্যাদের ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বসবাসাধিকারে প্রতিবাদ করে। তাই এ সময়ে কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা শুরু করলেন আন্দোলন। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে ঃ "আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম যে বিদ্যোৎসাহিনী সভার মেম্বর মহাশয়েরা এই বিষয় লইয়া গত শনিবার দিবসীয় সভায় গুরুতর রূপে আন্দোলন করিয়াছেন।" এই গুরুতর আনন্দ-অনুষ্ঠানের ঘোষণা করেছিলেন বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ "অদ্য শনিবার যামিনী ৭ ঘটিকায় সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভায় বেশ্যাগণের বাস করিবার নিমিত্ত এক নির্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয়' তন্নিমিত্ত লেজিসলেটিভ কৌন্সেলে আবেদন অর্পণ হইবেক তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ হইবেক, দর্শক ও সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়া বাধিত করিবেন।"

আবেদনপত্রটি অবশ্য দেড় বছর আগেই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল। মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক-সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়কে আবেদন করা হয়েছিল "হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্র নিবসতি আজ্ঞা করুন।"[১] স্পষ্টতই মনে হতে পারে হঠাৎ কালীপ্রসন্ন কলকাতার সমসাময়িক বহু বিচিত্র সমস্যার কথা ভুলে বেশ্যাবসতি নির্দিষ্ট করার আন্দোলনে ব্রতী হলেন কেন? এখানেই কালীপ্রসন্নের বাল্যজীবনের শিক্ষা-দীক্ষার কথা ধরা পড়েছে। ছ'বছর বয়সে পিতৃহীন কালীপ্রসন্ন ধনী নব্যবঙ্গ মাত্র হয়েছিলেন, স্কুল-কলেজের বাঁধাধরা শিক্ষায় তেমন এগোননি। "কালীপ্রসন্নের বাল্যকালাবধি অতিশয় চতুরতা ছিল। পরিহাস অতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার এক জন শিক্ষক বলেন, একদিবস তিনি অন্য অন্য ছাত্রের সহিত বহির্দৃশ্যমান প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, এ মত সময়ে হঠাৎ পার্শ্বস্থিত এক বালকের মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন। শিক্ষকের নিকটে অভিযোগ হইলে কালীপ্রসন্ন কাল্পনিক গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'মহাশয়! আমি জাতিতে সিংহ, জাতীয় স্বভাব ত্যাগ করিতে না পারিয়া এক থাবা মারিয়াছি।' এই চঞ্চলতা নিবন্ধন তিনি বিদ্যালয় বড় উন্নতি করিতে পারেন নাই।" বিদ্যালয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে নাবালক কালীপ্রসন্নের পৈতৃক সম্পত্তির ট্রাস্টি ও অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্নের লেখাপড়ার জন্য বাড়িতে ডিবেটিং ক্লাব 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেছেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই সভায় ধনী যুবক কালীপ্রসন্নের কাছে বিভিন্ন ধরনের মোসাহেব আশ্রয় পেতে থাকেন। ফলত বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে রুচিবিকৃতি অনুপ্রবেশ করে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, নিন্দুকেরা বিদ্যোৎসাহিনী সভাকে বলতেন মদ্যোৎসাহিনী সভা। বস্তুত বিদ্যোৎসাহিনী সভার অনুসরণ করে মাইকেল মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার অঙ্কন করেন। এই প্রহসন শোভাবাজার

১ পরবর্তীকালে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'সমাজ কুচিত্র'-এ এই বক্তব্যই পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটিতে প্রাক্ অভিনয়ের রিহার্সালও শুরু হয়। সোসাইটির সভাপতি কালীপ্রসন্ন স্বাভাবিক ভাবেই তা মেনে নিতে পারেননি। সম্ভবত এই জন্যই এই প্রহসনের অভিনয়ও একাধিক বার হ'তে পারে নি। তবুও অজ্ঞাত কারণে কালীপ্রসন্ন সোসাইটি ত্যাগ করেন এবং সোসাইটি ভেঙেও যায়।

বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে অন্যান্য কাজকর্মও হতো; যথা, অনুবাদ-ক্রিয়া, প্রবন্ধ পাঠ; কিন্তু আলোচনা নিছক নিরামিষ ছিল না। তবু এই সভাতেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিয়ে সুবিশাল মহাভারত অনুবাদের ব্যাপক কাজও হয়েছে। এরই ফলে নিন্দিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার দুর্নাম হলো 'বেশ্যালয়ে সরস্বতী পূজা'। বস্তুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় নক্‌শার উতোর 'আপনার মুখ আপনি দেখ' প্রহসনের প্রথম খণ্ডে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দ্বিতীয় খণ্ডে এই বেশ্যালয়ে সরস্বতী পূজো নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। তবু এ আলোচনা শেষ পর্যন্ত করেছিলেন সভা-চিড়িয়াখানার এক 'নিশাচর' ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সমাজ কুচিত্র'-এ।

তবু বলা যায়, এতে ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই। কালীপ্রসন্ন এমন কিছু অস্বাভাবিক কুকাজ করেননি। পিতৃহীন ধনী নব্যবাবু সেদিনের কলকাতার কুৎসিত অন্ধকারের শিকার হয়েছিলেন। তাঁর অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাধ্যমে চেয়েছিলেন কালীপ্রসন্নের 'বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি' হোক। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবন্ত ব্যক্তিব্যূহের উৎসাহে এই বয়সেই অর্থের কৃপায় সমাজ-গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ালেন। বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার সম্পাদক হলেন। সভ্য-পণ্ডিত-অনুবাদক দ্বারা বিভিন্ন অনুবাদ নাটক প্রকাশ করলেন। কালীপ্রসন্নের বয়স, অভিজ্ঞতা, বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি, মানসিক প্রস্তুতি কিছুই—মৌলিক রচনা দূরে থাক, অনুবাদ করারও ধৈর্য প্রমাণ করে না। অথচ কালীপ্রসন্নের অর্থকটাক্ষে বহুজনের বহু রচনার পিতৃত্ব কালীপ্রসন্ন অর্জন করেছিলেন। মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে (যথা, 'বাবু নাটক', 'বিধবোদ্বাহ নাটক') এ প্রশ্ন আজ আর ওঠে না বটে, তবে অনূদিত নাটক ও মহাভারতের ক্ষেত্রে তাঁর কলমের কৃতিত্বের কথা এ যুগেও কেউ কেউ বলে থাকেন।

মোটামুটি বোঝা গেল, কালীপ্রসন্নের বাল্যজীবন ও শিক্ষা-দীক্ষা কোনো কিছুই সাহিত্যগত প্রমাণের পক্ষে নয়। প্রশংসনীয় বৈচিত্র্য ছিল তাঁর সাহিত্য-যশ-খ্যাতির লোভ। সেকালে এই বিচিত্র বাসনা বহু ধনীরই ছিল। তাঁরাও ভাড়াটে লেখক দিয়ে বই লিখিয়ে বা অনুবাদ করিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করেছেন। এই চাতুর্য অন্যান্যদের ক্ষেত্রে জুতসই হয়েছিল, কারণ বেতনভুক্ কলমধারীদের কলম পরবর্তীকালেও স্বনামে অন্যত্র তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি। কিন্তু শোভাবাজারের উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের মতো কালীপ্রসন্নও এমন একজনের কলম ভাড়া নিয়েছিলেন যিনি পরবর্তীকালে স্বনামে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভুবনচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের জনপ্রিয়তা কালীপ্রসন্নের শাস্ত্র-স্বীকৃতিতে কিছু ঢিল ফেলে ঢেউ তুলেছে। এক দিকে কালীপ্রসন্নের পক্ষে 'নক্‌শা' রচনার ক্ষমতা বিশ্বাসযোগ্য নয়, অন্যদিকে এ ধরনের 'নক্‌শা-ধর্মী' অজস্র রচনার খ্যাতি পেলেন সেই ভুবনচন্দ্রই যিনি 'নক্‌শা' রচনাকালে কালী-প্রসন্নের অন্যতম অগ্রাঙ্গী সঙ্গী। সন্দেহ দানা বাঁধে এখানেই।

শুধু প্রথম জীবনের অ-প্রস্তুতিই নয়, 'নক্‌শা' রচনার যোগ্যতা প্রশ্নে কালীপ্রসন্নের শেষ জীবনও অনুকূল ছিল না। 'নক্‌শা'র আগে-পরে তাই কালীপ্রসন্নের নামে কোনো মৌলিক রচনা নেই, যা কোনো দিক্ দিয়েই 'নক্‌শা'র কাছাকাছি মনে করা যেতে পারে। আমাদের ব্যক্তিগত অনুমানে এই তথ্যটির গুরুত্ব অপরিসীম। 'নক্‌শা' বাংলা সাহিত্যের প্রকাশনা জগতে সহজ কথায় বটতলার বাজারকে অজস্র উতোরে সহস্র অনুকরণে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন এর পর দশ বছর বেঁচে থাকলেও 'নক্‌শা'-ধর্মী রচনায় এগিয়ে আসেন নি। তথ্যগত বিচারে

দেখা যায় কালীপ্রসন্ন এ সময় ক্রমশই নৈতিক মানে নেমে যাচ্ছিলেন। তাঁর বিষয়-সম্পত্তিও বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলে চরিত্রহননের অভিযোগ উঠতে পারে, কিন্তু তাই দেখবো, ভুবনচন্দ্র কালীপ্রসন্নের অবর্তমানে জীবিকার সন্ধানী। মহাভারত অনুবাদে অংশগ্রহণের কাজ ছেড়েই চাংড়ীপোতায় গিয়ে তিনি হলেন 'সোমপ্রকাশ'-এর সহ-সম্পাদক। ১৮৬৮ সাল থেকেই তিনি হয়েছেন 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সহ-সম্পাদক। স্বনামে, বেনামে, ছদ্মনামে ভুবনচন্দ্র তখন অনর্গল রচনা করেছেন 'নক্শা'-ধর্মী বিচিত্র রচনা—'সমাজ কুচিত্র' যাঁর সূচনা। অর্থাৎ কালীপ্রসন্নের শেষ জীবনে ভুবনচন্দ্র অন্যত্র জীবিকা সন্ধান করে চলেছেন।

কালীপ্রসন্ন যুগের অসুখে মারা যাবার আগেই মান-সম্মান, বিষয়-সম্পত্তি সব কিছুই হারিয়েছেন। সাহিত্যজীবিকা নিয়ে ভুবনচন্দ্র তখন ক্রমশই উচ্চগামী। ডিকেন্সের বই অনুবাদ করে ধনী সমাজপতিদের কেচ্ছাকে সাহিত্যের ভোজে পরিবেশন করার দুঃসাহস তাঁকে যুগিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন। তাই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা 'সমাজ কুচিত্র' তিনি উৎসর্গ করেছেন "সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয় অনারেবল্ হুতোম"-কে। বিকৃত রুচিবশে ব্যক্তিগত পরচর্চার বাসনা তৃপ্ত করতে অজ্ঞাতেই কালীপ্রসন্ন ভুবনচন্দ্রকেই সাহিত্যজগতে প্রথম পদক্ষেপের সুবিধা করে দিয়েছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। আর এই উৎসর্গ সেই উপকারেরই কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

কালীপ্রসন্নের চরিত্রগত দুর্বলতার খতিয়ানে আমাদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু প্রথম যৌবনে তাঁর যশোলোভ-প্রবণতার বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কালীপ্রসন্নের পোষা মোসাহেব মহলকে বলা হয়েছে 'চিঁড়িয়াখানা'। আহিরীটোলার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'নক্শা' ও কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধবাদী। ভোলানাথের কলমেই 'নকশা'র প্রথম উতোর 'আপনার মুখ আপনি দেখ'। সম্ভবত ভোলানাথ ছিলেন আহিরীটোলার কানাইলাল লাহার মোসাহেব। আমার মনে হয় আহিরীটোলার কানাই লাহার সঙ্গে যোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্নের ছিল তীব্র মতান্তর। 'নক্শা'য় কানাই লাহাকে বেনামে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আজ তা আবিষ্কার করা অবশ্য কঠিন। কিন্তু এই উপলক্ষে কানাই লাল বনাম কালীপ্রসন্নের লড়াইটা হয়ে দাঁড়ালো দুই ভাড়াটে মোসাহেব ভুবনচন্দ্র ও ভোলানাথের লড়াই। সম্ভবত এই উপভোগ্য দ্বন্দ্বের কথাই মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সম্পাদক' গল্পে একটি তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। গল্পে পরস্পর বিবদমান দুটি পাঁশাপাশি গ্রামের লড়াই চলছে ভাড়াটে সম্পাদকের কলমে। গ্রাম দুটির নামও কৌতূহলজনক—আহির গ্রাম ও জাহির গ্রাম। আহিরীটোলা ও যশজাহির গ্রাম বললে বোধ হয় ব্যাপারটা স্পষ্ট হতো।

বোঝা যাচ্ছে কালীপ্রসন্নের যশোলোভ কুখ্যাত হয়ে পড়েছিল। এই যশের বাসনায় কালীপ্রসন্ন ভালো কাজও করেছেন কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যাপারেও তিনি অংশ নিতেন। এই সুনাম লাভের অযথা লোভের জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবেই ব্যঙ্গের কবলে পড়তেন। 'বসন্তক' পত্রিকায় ইন্ডিয়ান ফিনান্স কমিটির হিন্দুসাক্ষী চরিত্রে তাঁকে লক্ষ্য করা হয়েছে ঃ

সাহেব—তুমি আজ কি বিষয়ে সাক্ষী দিবে ?

সাক্ষী—আজ্ঞে, আমি আজ ২৫ বৎসর কর্ম করিতেছি। ইহা ছাড়া আমি বিদ্যোৎসাহী সভার সম্পাদক, ব্যবস্থা সভার সভ্য, কলিকাতার একজন জষ্টিস্—আমি খানকতক পুস্তকও ছাপাইয়াছি…ইত্যাদি। লক্ষণীয় সাক্ষী পুস্তক লেখেন নি, ছাপিয়েছেন।

যশোলোভে তিনি জড়িয়েছিলেন 'নীলদর্পণ' অনুবাদের ব্যাপারে। 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করানো ও প্রকাশের জন্য লঙের বিরুদ্ধে মামলা হয়। সেই মামলায় লঙের হয়ে জরিমানা

দেবার জন্য জমিদারদের মধ্যে হিড়িক পড়ে যায়। এক হাজার টাকা (কেউ বা বলেন দশ সহস্র টাকা) জরিমানা জমা দেবার সৌভাগ্য লাভ করেন কালীপ্রসন্ন। কোর্ট খরচ দেন প্রতাপচন্দ্র সিংহ। অর্থাৎ ব্যাপারটা যেন যশ অর্জনের নীলাম। মহাভারত অনুবাদ করানোর মতো নক্‌শা রচনা করানোর মধ্যেও এই যশ অর্জনের লোভ লক্ষণীয়। সমসাময়িক অন্যান্য ধনীসমাজপতিদের নিন্দা নিয়ে রঙ্গ করা কালীপ্রসন্নের হয়তো সাজে না। তবু তিনি যশের লোভেই একাজ করিয়েছিলেন। কলকাতায় জলের কল স্থাপন, ল্যাঙ্কাশায়ারের দুর্ভিক্ষে অর্থদান, নীলদর্পণের অনুবাদ প্রসঙ্গে জরিমানা দান, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে অর্থদান—এ সবেরই যশলাভের আশায় কালীপ্রসন্নের বহুমুখী অর্থদান। নক্‌শার উতোর প্রসঙ্গে সহস্র উতোরে কালীপ্রসন্নেরই জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বহুমুখী দান এবং আনুষঙ্গিক বিকৃত ব্যাভিচারকেই তীব্র ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র রচয়িতা তাই বেশ্যালয়ে সরস্বতী পুজার উন্মাদনা ধরে রেখেছেন তাঁর প্রহসনে। অর্থাৎ কালীপ্রসন্নের দান ছিল যশ-অভিমুখী। সাহিত্য সৃষ্টিতে বা অনুবাদ-প্রকাশে কালীপ্রসন্নের দান এই ভাবেই ছড়িয়েছে, ব্যক্তিগত সাহিত্য-প্রতিভায় নয়। আমাদের আলোচ্য হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় কালীপ্রসন্নের কলম অনুপস্থিত থেকে এই অর্থদান ও ধনী জমিদারের বিকৃত রুচি প্রধান কাজ করেছে। তাই নক্‌শার প্রকৃত লেখক কে ? এই প্রশ্ন।

'নক্‌শা' যে কালীপ্রসন্নের রচনা নয়, ভুবনচন্দ্রের রচনা এই অনুমান প্রথম করেছেন ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন। কয়েকটি আনুষঙ্গিক তথ্যে তাঁর এই সন্দেহ প্রকাশ—যা মূল নক্‌শা পড়তে গেলেই চোখে পড়ার কথা। যেমন, 'নক্‌শা' হুতোম প্যাঁচার প্রথম রচনাকুসুম বলা হয়েছে নক্‌শায়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের নামে এর আগেই অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। উপরন্তু ভুবনচন্দ্রের কলম যদি নক্‌শায় কাজ করে থাকে তবে এটি তাঁর প্রথম 'রচনাকুসুম' বলা যায়। বিশেষতঃ যখন এই প্রথম রচনাকুসুম জনপ্রিয় বাক্‌ভঙ্গিটিই ভুবনচন্দ্র বার বার গ্রহণ করেছেন তাঁর বহু রচনায়।

মুলুক চাঁদ শর্মাকে এই বই উপহার দিয়েছেন হুতোম প্যাঁচা। একটি জনপ্রিয় অনুমান, মুলুকচাঁদ শর্মা মানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু অনুমানটি ভুল। 'মুলুক' এই আরবী শব্দের অর্থ ঈশ্বর নয়, ভুবন। নক্‌শার ভূমিকায় বার বার বলা হয়েছে, হুতোম প্যাঁচার ঠিকানা 'আশ্‌মান'। এই আশমান ঠিকানা দেওয়ার রীতিটিও লেখক ভুবনচন্দ্র জনপ্রিয় করেছিলেন। 'আমার গুপ্ত কথা'র লেখক 'সবজান্তা' তাঁর ঠিকানা দিয়েছেন আশমান। এইখানে একটি সূক্ষ্ম সূত্র নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার প্রথম খন্ডে ভূমিকার পরে একটি অমিত্রাক্ষরে প্যারডি ছিল।—যে প্যারডি পড়ে বিদেশে মাইকেল উত্তেজিত হয়ে কবিতা লেখেন 'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া'। লক্ষণীয় বিষয় নক্‌শার দ্বিতীয় খন্ড যখন প্রথম খন্ডের সঙ্গে একত্রে এক খণ্ডে প্রকাশ করা হলো তখনি বিতর্কিত প্যারডিটি বর্জিত হয়। এখন আমরা জানি, কালীপ্রসন্নের ভুবনচন্দ্র মাইকেলেরও লিপিকর ছিলেন। সম্ভবত তাঁরই চেষ্টায় মাইকেল ও কালীপ্রসন্নে এই সময় কোনো আপোশ হয়েছিল ; অর্থাৎ ভুবনচন্দ্র তখন নক্‌শা প্রসঙ্গে সক্রিয়। বস্তুতঃ এই প্রসঙ্গটি আরও স্পষ্ট হতে পারে মাইকেলের 'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' শীর্ষক কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে।

ভুবনচন্দ্র যে নিত্যনূতন ভাঁড়ামিতে প্রভু কালীপ্রসন্নের তৃপ্তি আনতেন, তার ইঙ্গিত নক্‌শার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মুটের মাথায় চাপা বিদূষকের গল্পে পাওয়া যায়। বিশেষত বিদূষকের মুখে 'এই এক নূতন' কথা বলার ভঙ্গিও 'গুপ্তকথার' ভুবনচন্দ্রের কলম মনে করিয়ে দেয়।

"হুতোম প্যাঁচার নকশা দ্বিতীয় খণ্ড সংরচন কালে 'কালীপ্রসন্ন' ব্যাসদেবের স্থানীয় ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদুপলক্ষে শ্রীগণেশ জীউ। কথঞ্চিৎ পার্থক্য প্রদর্শনই এক্ষণে আমার লক্ষ্য।...মূল সংস্কৃত মহাভারতে গণেশের কোন রচনা নাই। এখানে তাহার অস্তিত্ব আছে। সময়ে সময়ে ভুবনচন্দ্র কিছু কিছু 'হুতোমে' লিখিয়া দিতেন। স্বভাব-সিদ্ধ ঔদার্য গুণে সিংহ সেগুলি সমাদর সহকারে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত কি সংকুচিত হইতেন না।"[১]

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিতে বোঝা যাচ্ছে নকশার দ্বিতীয় খণ্ডে কালীপ্রসন্ন কথক, ভুবনচন্দ্র লেখক। স্থূল কথা বলেছেন কালীপ্রসন্ন কিন্তু লিখেছেন ভুবনচন্দ্র। ভুবনচন্দ্র দরিদ্র, যাঁর জীবিকার অবলম্বন ছিল কলম। সারা জীবন অন্যের নামে বহু বই লিখেছেন ভুবনচন্দ্র। সবচেয়ে জনপ্রিয় উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের প্রচারিত 'এই এক নূতন আমার গুপ্ত কথা।' বইটির ভূমিকায় (কৌতূহল পরিতৃপ্তিতে) জানা যাচ্ছে "কলিকাতার শোভাবাজারের রাজকুলকিশোর স্বজাতীয় কাব্যসাহিতের অকপট মিত্র শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এবং উপাখ্যানের স্থূল গ্রন্থী, স্থূল মর্ম, স্থূল বৃত্তান্ত এবং স্থূল স্থূল সমস্ত আখ্যানকাণ্ড আখ্যান করেন। তাঁহার উপদেশে তাঁহার সাহায্যে এবং তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে, তাঁহার অকৃত্রিম পরম মিত্র সংবাদ প্রভাকর পত্রের সহ সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপযুক্ত অলংকারাদি যোগে উক্ত রাজকুমার বাহাদুরের সহায়, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে, উত্তেজনায় আর মনোনিবেশে এই আখ্যানটি রচনা করেন।" অর্থাৎ 'গুপ্তকথার'ও স্থূল কথা বলেছিলেন উপেন্দ্রকৃষ্ণ, লিখেছেন ভুবনচন্দ্র। কিন্তু একথা বিশ্বাস করাতেও কিছু অসুবিধা আছে। গুপ্তকথার প্রকৃত লেখক কে, এই প্রশ্ন গুপ্তকথার দ্বাদশ সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ভুবনচন্দ্র স্বনামেই বইটি প্রকাশ করেন। এছাড়া গুপ্তকথা ধরনের আরও অজস্র রচনা পরবর্তী কালে ভুবনচন্দ্র স্বনামে লিখেছেন, কিন্তু উপেন্দ্রকৃষ্ণ আর একটিও নয়। দ্বিতীয় কারণ হলো মূলত গুপ্তকথার রেনল্ডসের 'জোসেপ উইলমটে'র অনুবাদ। স্থূল কথা সেখানেই। ভুবনবাবু, মূল বিদেশী উপন্যাসকে দেশী পোশাকে অনুবাদ করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, উপেন্দ্রকৃষ্ণ যখন 'গুপ্তকথা'র অনুবাদ প্রকাশের 'উত্তেজনা' অনুভব করছিলেন, তখন তাঁর বন্ধু শ্যামবাজারের ডাক্তার ফকিরচন্দ্র বসু সেখানে উপেন্দ্রকৃষ্ণের কাছে ভুবনচন্দ্রকে হাজির করেন। কারণ ফকিরচন্দ্র বসু জানতেন ভুবনচন্দ্র এই কাজ করেই জীবিকা সন্ধান করেন। ফরিকচন্দ্র বসুর 'উজির পুত্র' উপন্যাসের ভূমিকায় জানা যায়ঃ "নূতন বাঙ্গলা যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্তবাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত কবিবর শ্রীযুক্তবাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভাকরের প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্তবাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই মিত্রত্রয়ের সাহায্যে 'উজির পুত্রে'র প্রথম পর্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।"

উপরি-উক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত ও বিহারীলাল চক্রবর্তী ভুবনচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। যেদিন মাইকেলের মৃত্যু হয়, এই দুই বন্ধুর অনুরোধে ভুবনচন্দ্র 'দুই ঘণ্টার মধ্যে' একখানি অমিত্রাক্ষর কাব্য রচনা করেন—মধুবিলাপ। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদার' বিশেষ ভক্ত ছিলেন ভুবনচন্দ্র। ফকিরচন্দ্র 'উজির পুত্র' উপহার দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকৃষ্ণকেই। এইভাবে উপেন্দ্রকৃষ্ণ ও ভুবনচন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দেন ফকিরচন্দ্র। তাই দেখি ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুম কুমারী' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ (ভাদ্র ১২৭৯) যৌথভাবে সংশোধন করছেন ভুবনচন্দ্র ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ। বলা বাহুল্য, পরের রচনা সংশোধন করা উপেন্দ্রকৃষ্ণের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভব নয়। এ কাজ ভুবনচন্দ্রের একক কৃতিত্ব।

১. 'বাংলা প্রথম প্রাত্যহিক পত্র'—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, 'জন্মভূমি পত্রিকা'।

ভুবনচন্দ্রের এ বৃত্তিতে সবচেয়ে বেশি মদত দিয়েছেন ফকিরচন্দ্র। তাই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে টাকীর কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'অমরনাথ' নাটকও ভুবনচন্দ্র লিখে দিলেন। বইটি উৎসর্গও করা হলো ফকিরচন্দ্র বসুকে। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন মনে করেন, 'অমরনাথ'-এ 'গুপ্তকথা' ও 'নকশা'র রচনারীতির মিশ্রণ আছে।

আগেই বলেছি, গুপ্তকথা উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নামে প্রকাশিত হয়ে জনপ্রিয় হওয়ার পর ভুবনচন্দ্র দিনের জীবিকা উদ্বোধন করার জন্য স্বনামে 'গুপ্তকথা' প্রকাশ করলেন। বলা বাহুল্য উপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রকাশক পুত্র অসীমকৃষ্ণ খুশি হননি। তিনি পিতার নামে গুপ্তকথা প্রকাশ করে 'ষড়্ চক্রভেদ' প্রসঙ্গে জানালেন ঃ "এবারের কৌতূহল পরিতৃপ্তি ও 'বিদায়' শীর্ষক মধ্যে ভুবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নাম প্রকাশিত হল না কেন ? এ পুস্তকের সৃষ্টিকর্তাই যদি ভুবনচন্দ্র তার নাম না দিবার কারণ কি ? সৃষ্টিকর্তাও নয়, বিরচন কর্তাও নয় কিছুই নয় তার সহিত এ গ্রন্থের সংস্রব মাত্রও নাই। সম্পর্ক নাই কেন ? বিলক্ষণ আছে। কৌতূহল পরিতৃপ্তির বিজ্ঞাপনে উক্ত মহাত্মার নাম কি সূত্রে ধর্মবন্ধ হয়েছিল তা আমরা নিম্নভাগে লিপিবন্ধ কোল্লেম।" ফকিরকৃষ্ণের আপোশেই ভুবনচন্দ্রের নাম লিপিকর হিসাবে রাখা হয়েছিল "কিন্তু ভুবনবাবু যে গ্রন্থকার নন এ গ্রন্থের সহিত তাঁহার যে কোন সংস্রব নেই সে ব্যক্তির স্বহস্ত লিখিত একখানি ইষ্টাম্প কাগজেই এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে সব প্রকাশ আছে। এক্ষণে দ্বাদশ বর্ষ অতীত এ পর্যন্ত কোনই গণ্ডগোল উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমরাও একাল পর্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। কিন্তু তৎপর যখন সেই লিপিকার মহাশয়ই পুস্তকের গ্রন্থকার বলে বিজ্ঞাপন (যদিও ঘোরফের) দিতে কুণ্ঠিত হলেন না তখন আমাদেরও আর মৌনব্রত অবলম্বন উচিত কার্য বলে বোধ হয় না।"

কিন্তু ক্রমশই এ-কথা সুপ্রমাণিত হয়ে গেল যে মূল লেখক ছিলেন ভুবনচন্দ্র। আর উপেন্দ্র-কৃষ্ণের আর্থিক আশ্রয়ে ভুবনচন্দ্র ছিলেন বলেই এই লেখক-'বিভ্রাট।' ভুবনচন্দ্রের এই স্বনাম প্রতিষ্ঠার কাজে পরবর্তীকালে সাহায্য করেছিল তাঁর কলম—ভুবনচন্দ্র পরবর্তী জীবনে 'গুপ্তকথা' নামে, ধাঁচে অজস্র সহস্র রচনা লিখলেন কিন্তু উপেন্দ্রকৃষ্ণ আর ও-পথ মাড়ালেন না। 'রত্নগিরি' নামে একটি উপন্যাস অবশ্য পরবর্তীকালেও প্রকাশিত হয়েছিল যার ভূমিকায় উপেন্দ্রকৃষ্ণ ভুবনচন্দ্রের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এবং ডক্টর সুকুমার সেনের ধারণা 'রত্নগিরি' 'অবশ্যই' ভুবনচন্দ্রের রচনা।

গুপ্তকথা মূলত অনুবাদ-আশ্রয়ী। সেক্ষেত্রে 'স্থূলকথা' মূল গ্রন্থের—অন্য কেউ এ কৃতিত্ব নিতে পারেন না। আর 'স্থূলে কথা' শুনে (বা না শুনেও) ভুবনচন্দ্র লিখতে পারতেন। তাই সেক্ষেত্রেও রচনার কৃতিত্ব কার—'স্থূলে কথা' যিনি বলেছেন বা প্রকৃতপক্ষে যিনি লিখেছেন তাঁর ? সে যাই হোক, 'গুপ্তকথা'র ক্ষেত্রে 'স্থূলকথা' উপেন্দ্রকৃষ্ণ আদৌ বলেননি। এমন কি ভুবনচন্দ্র গুপ্তকথা কয়েক ফর্মা লিখে ফেলার পরেই নাকি সেই লেখা পড়ে উপেন্দ্রকৃষ্ণ আগ্রহ বোধ করেন এবং ফকিরচন্দ্র বসুর মাধ্যমে ভুবনচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এখন দেখা যেতে পারে 'নকশা' কতটা মৌলিক বা অনুবাদ-আশ্রয়ী। একথা ঠিক, হুতোম প্যাঁচার নকশা নতুন ধরনের, নতুন জাতের রচনা—বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বসূরী নেই। যদিও 'আলালের ঘরের দুলাল'কে এই পূর্বসূরীর সম্মান দেবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু ভাষাগত ক্ষেত্রে এ কৃতিত্বের কথা কিছুটা সত্য হলেও সমসাময়িক সমাজচিত্রের ব্যঙ্গ বর্ণনার ক্ষেত্রে নকশা প্রথমতম। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ভাষায় 'An early specimen of that type of writing.' স্বভাবতই সন্দেহ জাগতে পারে এ চিন্তা এসেছিল অনুবাদের পথ ধরে। অবশ্য ডক্টর সেনের ধারণা গুপ্ত কবির 'বড়দিন' 'স্নানযাত্রা' প্রভৃতি কবিতাগুলিই

নক্শার প্রথম প্রেরণা। কিন্তু এ বোধ হয় বিষয়-বর্ণনার ক্ষেত্রেই। কিন্তু রচনাধর্মের (Style-এর) ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাব থাকতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র নক্শাকে তাই বলেছেন :

> "Something, after the maner of Dickenses Sketches by Boz in which the follies and peculiarities of all classes and not seldom of men actually living are described in racy vigorous language, not seldom disfigured by obscenity." (Bengali Literature—The Calcutta Review 1871).

সেক্ষেত্রে এ অনুবাদ-আশ্রয়ী চেতনার জন্যও ভুবনচন্দ্রের কথাই সর্বপ্রথম মনে পড়ার কথা। মূল বক্তব্য বা স্থূলকথার কথক সেখানে কেউ থাকতে পারে না। তবে কাকে আঘাত করা উচিত বা অনুচিত বা স্বার্থ-বিরোধী—এই সব সুবিধাজনক ইঙ্গিত স্বয়ং সমাজপতি কালীপ্রসন্ন লেখক ভুবনচন্দ্রকে জানিয়ে থাকতেও পারেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নকে 'স্থূল কথা' বলার কৃতিত্বও দেওয়া যায় কি না সন্দেহ। ভুবনচন্দ্র যেখানেই অন্যের নামে রচনা লিখে দিয়েছেন এবং পরে লেখকত্ব দাবি করেছেন সেখানেই বলা হয়েছে ভুবনচন্দ্র ছিলেন লিপিকর আর যাঁর নাম লেখক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে তিনি বইটির 'স্থূল কথা'র কথক। ব্যাপারটা কতদূর হাস্যকর একটু জবাবদিহি করলে বোঝা যায়। মাইকেল মধুসূদনের অসমাপ্ত নাট্যরচনা 'মায়া-কাননে'র শেষ অঙ্কের স্থূলকথা বলে গিয়েছিলেন ছাতুবাবুর নাতি শরৎচন্দ্র ঘোষকে। শরৎবাবুর কাছে সেই স্থূলকথা শুনে এই অলিখিত শেষ অঙ্কটি ভুবনচন্দ্র লিখে দেন। কিন্তু মায়া-কাননের ভূমিকায় দেখছি বেঙ্গল থিয়েটারের পণ্ডিত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মায়া-কানন আদ্যপ্যান্ত 'সংশোধন' করেছিলেন। আরও দেখছি, সমসাময়িক সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশে' জনৈক কৈলাসচন্দ্র বসু দুঃখ করেছেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাইকেলের মায়া-কাননের লিপিকর ছিলেন আসলে তিনি। বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত মায়াকানন দেখে তিনি দুঃখিত—ওটা পুড়িয়ে ফেলাই উচিত। এখানে নাকি মাইকেলের রচনার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ সবটাই সংশোধনের নামে ভুবনচন্দ্রের রচনা। কিন্তু আজও আমরা বলি 'মায়াকানন' মাইকেলের শেষ রচনা। শেষজীবনে মৃত্যুমুখে অর্থের আশায় রচনা বলে মায়াকানন নাকি তেমন ভালো হয়নি। কেউ ভেবে দেখছেন না, কৈলাস বসুর ইঙ্গিত মতো ভুবনচন্দ্রের রচনা—মায়াকানন মাইকেলের প্রতিভার মর্যাদা রাখতে পারেনি। কারণ ভুবনচন্দ্র মাইকেলের মতো সৃষ্টিশীল কাব্যরচনার যোগ্য ছিলেন না। অথচ আজও বলা হচ্ছে মায়াকানন, যা মাইকেলের প্রতিভার উপযোগী নয় তার অন্তত শেষ অঙ্ক ভুবনচন্দ্রের রচনা হলেও 'স্থূলকথা' মাইকেলেরই। আদ্যোপান্ত ভুবনচন্দ্র সংশোধন করলেও মূল রচনা নাকি মাইকেলের।

আমাদের মনে রাখতে হবে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি জানিয়েছেন এই 'স্থূলকথার কথক ও লিপিকর' ব্যাপারটার শুরু নক্শার দ্বিতীয় খণ্ডে, প্রথম খণ্ডে নয়। এতে অনেকের ধারণা হতে পারে যে প্রথম খণ্ড রচনায় ভুবনচন্দ্র হয়তো লিপিকর ছিলেন না। প্রথমত আমাদের ভেবে দেখতে হবে নক্শার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড রচনার ভাব, ভাষা, ভঙ্গীতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আছে কি না। আজ পর্যন্ত কোনো জ্ঞানী-গুণী এ সন্দেহ করেন নি। অন্যান্য প্রমাণেও একথাই মনে হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে ; এককভাবে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির সম্ভাবনা ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে।

আমরা দেখবো, কালীপ্রসন্নের সঙ্গে ভুবনচন্দ্রের প্রথম আলাপ কখন ? ১৩ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভা আহ্বান করেই সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করতে বা করাতে

থাকেন। এই অনুবাদগুলোর রচনারীতি অনুসন্ধান করলে একটি কথাই মনে পড়ে। ডক্টর সুশীল দে বলেছেন, কালীপ্রসন্নের নাটকগুলো থেকে ক্রমশ সংস্কৃত নস্যের গন্ধ কেটে যাচ্ছে। বিক্রোমোর্বশী (১৮৫৭)—প্রথম উদ্যমের প্রশংসা করা যায় না সংস্কৃতগন্ধী কৃত্রিম ভাষার জন্য। তার পর 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮), 'মালতী মাধব' (১৮৫৯)। "ভাষা ও রচনা অনেক প্রাঞ্জল হইয়াছে সত্য কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে বলা যায় না। ভাষা এখনও সজীব ও স্বাভাবিক হয় নাই।...এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, কৃত্রিম সাধুভাষা পরিত্যাগ করিয়া অনুবাদক চলিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।" এই ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের পরেই নক্শা রচনা শুরু। সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষার দিকে পালাবদলের ঝোঁক। এখন কালীপ্রসন্ন যদি স্বয়ং নাটকগুলো অনুবাদ করে থাকেন তবে সন্দেহ হয় এ ধরনের কীর্তির কোনো প্রস্তুতি তাঁর জীবন, পরিবেশ ও শিক্ষায় আমরা লক্ষ্য করেছি কি না। এ যুগে ধনীরা নাটক রচনার যশ চাইতেন কলম দিয়ে নয়, অর্থ দিয়ে। প্রসঙ্গত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রকাশিত নাটক ও প্রহসনগুলিতে নাটুকে রামনারায়ণের আত্মীয়তা স্মরণীয়। কালীপ্রসন্ন যদি নিজেই রচনা করতেন তবে নক্শার পরেও তিনি কলম থামাতেন কি না সন্দেহ। আর নক্শার ক্ষেত্রে অন্তত লিপিকর হিসাবে ভুবনচন্দ্রের অস্তিত্ব সুস্বীকৃত। উপরন্তু সংস্কৃত নাটকগুলো যদি কালীপ্রসন্ন লিপিকর দিয়ে অনুবাদ করান সেক্ষেত্রে 'স্থূলকথা' কালীপ্রসন্নের—এ ধরনের তত্ত্ব হাস্যকর হবে। ডক্টর সেনের অনুমান, নাটকগুলো অনুবাদ করেছেন বিদ্যোৎসাহিনী সভার লিপিকর অনুবাদকরা। মহাভারত অনুবাদ করানোর জন্যে বহু পণ্ডিত অনুবাদককে বেতনভুক করেছিলেন কালীপ্রসন্ন। তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নাটক অনুবাদের ক্ষেত্রে এই অনুবাদকদের হাত থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও ভুবনচন্দ্র যে এ সময়ে কালীপ্রসন্নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় অন্যান্য সূত্রেও। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও যতীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'পরিদর্শক' পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন এই দুজনকে দিয়েই 'পরিদর্শক' পত্রিকা প্রকাশ করেন। যতীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, পরিদর্শক পত্রিকায় কালীপ্রসন্ন যখন যুক্ত ছিলেন না, ভুবনচন্দ্রও ছিলেন না। তবে কবিতা লিখে পাঠাতেন। এই ধরনের কবিতা পড়ে পরিদর্শক সম্পাদক জগন্মোহন তর্কালঙ্কার খুব খুশি। "১২৬৯ সালের মাঘ মাসে হঠাৎ ডাক যোগে তিনি [ভুবনচন্দ্র] একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন পুস্তকাধ্যক্ষ (আধুনিক প্রধান তান্ত্রিক গুরু) পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎকালে মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের চিৎপুরস্থ সারস্বতাশ্রমে সাহিত্য প্রচার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, ঐ পত্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ই লেখেন। নির্ঘণ্ট এই রূপ যে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় আপনাকে একবার দেখিতে চাহিতেছেন, শীঘ্র একবার তাঁহার চিৎপুরের 'সারস্বতাশ্রম' উদ্যানবাটীতে আগমণ করিলে আমি আহ্লাদিত হইব।... তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার [ভুবনচন্দ্রের] রচিত কবিতাগুলি দর্শন করিয়া লেখককে ভালবাসিয়াছিলেন সেই সূত্রেই এই আহ্বানপত্র। পত্রপ্রাপ্তির এক দিন পরে ভুবনচন্দ্র চিৎপুরে উপস্থিত হইয়া কালীপ্রসন্ন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন, কালীপ্রসন্ন বাবু এক দিনেই যেন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন।"

মনে রাখতে হবে এ সময় ভুবনচন্দ্রের নাকি কবিতা লেখা ছাড়া তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু কালীপ্রসন্ন তাঁকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করলেন 'পরিদর্শকে'র। মাস তিনেক পরে 'পরিদর্শক' উঠে গেল। "পরিদর্শক উঠিয়া গেলেও সদাশয় সিংহ মহাশয় ভুবনচন্দ্রকে নিকটে রাখিবার আকিঞ্চন পাইয়াছিলেন, ভাল করিব বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করিয়া দিবেন, এমন আশা ও ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন।"

কিন্তু কেন—যতীন বাবু তা বলেননি। ভুবনচন্দ্রকে কেন হঠাৎ কালীপ্রসন্ন ডেকে পাঠালেন ? সামান্য কবিতা-লেখককে পরিদর্শকের অন্যতম সহ-সম্পাদক করলেন ? তিন মাসের মধ্যে আবার সে পত্রিকাও উঠে যেতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দেব বললেন কেন, সে প্রসঙ্গে যতীনবাবু উচ্চবাচ্য করেন নি ; অথচ কালীপ্রসন্নের এই আকস্মিক ও অতি-উগ্র আগ্রহের সম্ভাব্য কারণটি অনায়াসেই অনুভব করা যায় নক্‌শার লিপিকর ভুবনচন্দ্র কালীপ্রসন্নের সন্তুষ্টিভাজন হয়েছিলেন।

প্রথম খণ্ডের ক্ষেত্রে বিতর্কিত হলেও দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তত ভুবনচন্দ্র নক্‌শার লিপিকর। নক্‌শা লিখার স্টাইলে দুটি খণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এবার দেখা যাক, কালীপ্রসন্নের পক্ষে নক্‌শা রচনা করা যেমন অ-স্বাভাবিক, ভুবনচন্দ্রের পক্ষে ঠিক ততটাই স্বাভাবিক কি না ! প্রাথমিক বিচারে বলা যায়, নক্‌শার স্টাইল ভুবনচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনায় সুস্পষ্ট। ভুবনচন্দ্রের জনপ্রিয় রচনা 'হরিদাসের গুপ্তকথা', 'বিলাতী গুপ্তকথা', 'আমার গুপ্তকথা' প্রভৃতি বহু রচনায় নক্‌শা ছড়িয়ে আছে। বিপরীত পক্ষে কালীপ্রসন্নের স্বরচিত কোনো মৌলিক রচনার সন্ধান না পাওয়ায় নক্‌শার সঙ্গে স্টাইল প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনাও সম্ভব হচ্ছে না।

দরিদ্র সাহিত্যজীবী ভুবনচন্দ্রের জীবনী সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় স্থান পেয়েছে। ভুবনচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি সংবাদ দিয়েছেন যা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উদ্ধার করেছেন ঃ

১. ভুবনচন্দ্র মাইকেলের লিপিকর-সহচর ছিলেন (এ তথ্য অবশ্য অন্যত্রও সুপ্রমাণিত)।

১ক. মাইকেলের মৃত্যুর দুঘণ্টার মধ্যে ভুবনচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মধুবিলাপ' রচনা করে শোকপ্রকাশ করেন।

১খ. মাইকেলের অসমাপ্ত নাট্যরচনা 'মায়া-কানন' সংশোধন ও সমাপনের দায়িত্বও পেয়েছিলেন ভুবনচন্দ্র। ব্রজেন্দ্রনাথ ভুবনচন্দ্রকে তাই বলেছেন, 'মধুসূদন-কালীপ্রসন্ন সিংহের উত্তর সাধক।'

২. ভুবনচন্দ্র আলালের সময় থেকেই গদ্য লিখছেন ; কিন্তু সে-সব গদ্য রচনায় ভুবনচন্দ্রের সর্বত্র নাম আবিষ্কার করতে পারিনি। দরিদ্র ভুবনচন্দ্র জীবিকার জন্য অন্যের নামে লিখতেন, এ কথা প্রমাণিত। যতীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন "নিজে [ভুবনচন্দ্র] তিনি নামলুব্ধ অথবা প্রশংসাকাঙ্ক্ষী নহেন বলিয়াই নামটির ততদূর প্রচার নাই, কেবল তৎপ্রণীত পুস্তকসমূহের প্রকাশকগণ আপনাদের আগ্রহা সহকারে কোন কোন পুস্তকের টাইটেল পেজে তাঁহার নাম দিয়াছেন দেখিতে পাওয় যায়।…আমরা শুনিয়াছি তাঁহার প্রণীত আর কয়েকখানি পুস্তক আছে। সে সকল পুস্তকে তাঁহার নাম নাই। লিখনপ্রণালী দেখিয়া যাঁহারা বুঝিতে পারেন কেবল তাঁহারা ভিন্ন সাধারণে তাহা অবগত নহেন।"

৩. ভুবনচন্দ্র রামনারায়ণ তর্করত্নের সময় থেকে একটানা লেখা শুরু করেছিলেন।

এখন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই তিনটি তথ্য থেকে বোঝা যায় ভুবনচন্দ্রের কিছু রচনা লেখকের স্বনামে প্রকাশিত হয়নি। 'গুপ্তকথা'র পরবর্তী যুগ থেকে জনপ্রিয় ভুবনচন্দ্র স্বনামে সুপ্রতিষ্ঠিত। তখন তাঁর নাম আখ্যাপত্র (title page) বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু 'গুপ্তকথা'র আগের পর্বে ভুবনচন্দ্র ছিলেন দরিদ্র, অখ্যাত, মসীজীবী। তাঁর নাম টাইটেল পেজে বাদ দেবার প্রশ্ন এই সময়ে উঠতে পারে।

তবু বলবো, ভুবনচন্দ্র মূলত ছিলেন সাংবাদিক। 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কবিতা লিখেই তাঁর যাত্রা শুরু। 'পরিদর্শক'-এও তাঁর প্রাথমিক পরিচয় এই সূত্রেই। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলো সাংবাদিকসুলভ সাময়িকতার ধর্মবাহী। 'নক্‌শা' ও 'গুপ্তকথা' দুটি ধারাবাহিক

ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে কালীপ্রসন্ন মারা যান, আর ডিসেম্বরে ভুবনচন্দ্র প্রকাশ করেন 'বিদূষক' পত্রিকা। এর পর শ্যামবাজারের ডাক্তার ফকীরচন্দ্র বসুর হয়ে 'উজির পুত্র' প্রকাশ করে দেন খণ্ড খণ্ড ভাবে। খোদ 'হরিদাসের গুপ্তকথা'ও প্রকাশিত হয়েছে ধারাবাহিক ভাবে। সেই সঙ্গে 'পূর্ণশশী' পত্রিকাও সম্পাদনা করে চলেছেন। 'তুমি কি আমার' উপন্যাসও এ সময়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 'রহস্য মুকুর'ও আট পেজী ১ ফর্মায় সপ্তাহে প্রকাশিত হতো। 'আশাচপলা'ও মাসিক। ব্যক্তিগত জীবনে ভুবনচন্দ্র প্রায় সারা জীবনই একটানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু খ্যাত ও অখ্যাত পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার সে সন্ধানও দেওয়া আছে। কিন্তু ভুবনচন্দ্রের দুটি সত্তা। একদিকে সাংবাদিক ও 'গুপ্ত কথা-নক্শা' মার্কা অজস্র রচনার সম্মিলনে যে বিচিত্র পত্রিকা গড়ে উঠেছিল তার বর্ণনা সেখানে পাইনি। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ভুবনচন্দ্র অন্তত অন্যতম সম্পাদক হিসাবে 'হুতম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র' প্রকাশ করেছিলেন।

'গুপ্তকথা'র মালিকানা দাবি করলেও ভুবনচন্দ্র স্বনামে কোনোদিনই 'নকশা'র মালিকানা দাবি করেন নি। প্রথমতম কারণ প্রায় সমবয়স্ক বন্ধু-সদৃশ প্রভুর প্রতি আনুগত্য। দ্বিতীয় কারণ, 'গুপ্তকথা' বাবদ তিনি স্বনামে সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'নক্শা'-লেখকত্বের দাবিতে সামাজিক দুর্নামের সম্ভাবনা, কারণ সমসাময়িক অনেক ধনী সমাজপতিকেই নক্শায় ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু 'গুপ্তকথা'য় নিছক বিদেশী কাহিনীর স্বদেশী ভাবানুবাদ।

কিন্তু তাই বলে হুতোমের জনপ্রিয়তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। ১৮৭৩-এর এপ্রিলে 'গুপ্তকথা' লিখে দিয়ে ১৮৭৫-এর ২৪শে এপ্রিল ৭৯ নং আহিরীটোলা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন—'হুতম'। সম্পাদকের নাম নেই। অনেকের অনুমান সম্পাদক—রাধামাধব হালদার। যেহেতু ৭৯নং আহিরীটোলাতে বাস করতেন রাধামাধব হালদার। একবার 'হুতম'-এর পাদটীকায় জানানো হলো "হুতম তাঁর কর্মাধ্যক্ষের মুখে অত্র সহরের জনৈক বিখ্যাত হালদার মহাশয়, তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে এরূপ আক্ষেপ করছেন শুনে দুঃখিত হলেন। হুতম মুক্তকণ্ঠে বলছেন যে কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে এ পুস্তকে কোন কেরেকটার চিত্রিত হয় নাই, তবে আপন প্রতিমূর্তি নিরীক্ষণ করে দেখলেই অনেকেই স্বীয় স্বীয় প্রতিবিম্ব হুতমে অধিক দেখতে পাবেন।" তাহলে সম্পাদক কে ছিলেন? 'হুতম' পত্রিকাতেই একটি বিজ্ঞাপনে জানা যায়, যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ উপলক্ষে 'হুতম' কার্যালয় থেকেই সাপ্তাহিক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। "বিখ্যাত হুতম-সম্পাদক, ভূতপূর্ব সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সামবেদ প্রকাশক আচার্য শ্রীব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী, প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় এবং জনৈক ইংল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাগত কৃতবিদ্য আর্যসন্তান দ্বারা এই পত্রিকাখানি সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।" এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, 'হুতম'-সম্পাদক এবং ভুবনচন্দ্র এক ব্যক্তি নন। কিন্তু পরে জানা যায়, 'যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ,' পত্রিকায় নিয়মিত লেখার জন্য 'হুতম পত্রিকার কোনও লেখক সাময়িকভাবে অবসর নিয়েছেন। সেই একমাত্র লেখকের অনুপস্থিতির জন্য সমগ্র 'হুতম' পত্রিকাটির প্রকাশ স্থগিত থাকে। সে লেখক কে? যাঁর একক অনুপস্থিতির জন্য অন্য চারজন সম্পাদক বহাল তবিয়তে উপস্থিত থাকা সত্ত্বে 'হুতম' প্রকাশ স্থগিত রাখতে হলো? প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দু'জনে মিলে কালীপ্রসন্নের অর্থসাহায্যে প্রথম প্রাত্যহিক পত্র 'পরিদর্শক' প্রকাশ করেছিলেন। জগন্মোহন ভুবনচন্দ্রকে কালীপ্রসন্নের কাছে পরিচিত হবার জন্য লিখিতভাবে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছিলেন। আরও স্মরণীয় এই, 'হুতম'-এর প্রকাশস্থান থেকেই

ভুবনচন্দ্রের আর এক অনুরাগী ফকীরচন্দ্র বসু 'সমাজরঞ্জন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

অর্থাৎ 'হুতম'-এর সম্পাদক-মালিক কোনো এক ধনী ব্যক্তি হলেও এর একমাত্র লেখক ছিলেন ভুবনচন্দ্র, যিনি তখন একাধারে সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক, পূর্ণশশী, বিদূষক, ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক, হুতম ও যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ পত্রিকার অন্যতম সহ-সম্পাদক এবং সমাজরঞ্জনের সহযোগী।

অতএব এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, 'হুতম'-এর বিতর্কিত সম্পাদক সেকালের ধনী সাহিত্য যশোলোভী সমাজপতি রাধামাধব হালদার হলেও 'হুতম'-এর প্রতিটি লেখা ভুবনচন্দ্রের কলম থেকে নির্গত।

এবার নকশাটি পড়ে দেখা যেতে পারে। নকশায় এমন কতকগুলো ধনীসমাজপতিদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে যাঁদের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের সামাজিক, বংশগত সম্পর্ক সুস্থ ছিল না। যুগোপযোগী বাবু-সভ্যতা উচ্ছৃংখল ব্যাভিচারের এইসব ধনীসমাজপতি শিকার ছিলেন। কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দিয়ে মহাভারত অনুবাদ করানোর মতো সুরসিক মোসাহেব দিয়ে এইসব সমাজপতিদের কীর্তিতে কটাক্ষ করালেন। নকশায় কালীপ্রসন্নের ব্যক্তিগত স্মৃতিচিত্রণেরও কিছু ইঙ্গিত আছে—যা নিজ মুখে বলার মতো প্রীতিকর নয়, কিন্তু অন্তরঙ্গ মোসাহেবের কলমে নিছক সরস রসিকতা। যেমন, মহাভারত অনুবাদক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের টিকি কেটে রেখে দেওয়ার ব্যাপারটি। স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একাজের জন্য কালীপ্রসন্নকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর 'টিকিমঙ্গল' কবিতায়। অমূল্যচরণ সেন 'অর্ঘ্য' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩১৮-র সংখ্যায় এই টিকি কাটার গল্পটি গুজব বলে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু খোদ 'নকশা'তেই টিকি কাটার প্রসঙ্গটির সরস উল্লেখ আছে।

'নকশা'-লেখক যে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই অনুমান যাঁরা করেছেন, তাঁদের যুক্তি হলো—

১. এ সময়ে বই যিনি টাকা দিয়ে ছাপাতেন তিনি যদি ধনী সমাজপতি হন এবং মূল রচয়িতা যদি অখ্যাত হন তখন টাইটেল পেজে অর্থ-সাহায্যকারী ধনীর নাম লেখক হিসাবে মুদ্রিত হতো। এ কথা সত্য নয়।

২. 'নকশা' ছাপা হয়েছে রাম প্রেসে—যেখানে কালীপ্রসন্নের মালিকানায় 'পরিদর্শক' প্রকাশিত হয়েছে।

৩. কালীপ্রসন্ন ছাড়া অপর কেউ নিজেকে নকশার লেখক বলে দাবি করেন নি—যেমন, গুপ্তকথার ক্ষেত্রে।

৪. 'নকশা'র বহু জায়গায় কালীপ্রসন্নের ব্যক্তিজীবন-স্মৃতি, গর্ব-যশ-কাহিনী উত্তম পুরুষে বর্ণনা করা হয়েছে।

ধনীসমাজপতি হিসাবে কালীপ্রসন্ন এ সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য ধনীর সঙ্গে কালীপ্রসন্নের পার্থক্য তাঁর সাহিত্য যশোলোভের। সেই সঙ্গে ছিল বিদ্যাসাগরের স্নেহ-ভালবাসা। নববাবু হয়েও যুগোপযোগী উচ্ছৃংখলতার শিকার হওয়া সত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরের অনুরোধে সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব নিয়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়েছেন। প্রথম প্রাত্যহিক পত্র প্রকাশ করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রশংসা করেছেন বিদ্যোৎসাহিনীর সভায়; লঙ্ সাহেবের জরিমানার টাকা দিয়েছেন, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নীকে আর্থিক আশ্রয় দিয়েছেন, এ ছাড়া ল্যাঙ্কাসায়ারে দুর্ভিক্ষে অর্থ সাহায্যও করেছেন। এমন যশোলোভী কালীপ্রসন্ন যুগের ধর্মে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' লিখিয়েছেন অন্তরঙ্গ মোসাহেবদের দিয়ে। কিন্তু লিখিতভাবে লেখকত্বের দাবি করেননি। অর্থাৎ 'গুপ্তকথা'র ক্ষেত্রে অর্থ-

সাহায্যকারী উপেন্দ্রকৃষ্ণ লেখকত্বের দাবি করেছিলেন, কিন্তু নক্‌শার ক্ষেত্রে অর্থসাহায্যকারী কালীপ্রসন্ন নিজেই লেখকত্বের দাবি করেন নি, তাই বিপরীত দাবিদারের প্রশ্ন উঠবে কি করে ?

১. কালীপ্রসন্নের রচনা-দক্ষতা এবারে বিচার্য। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' লেখার ক্ষমতা, মানসিকতা ও চরিত্র কালীপ্রসন্নে ছিল কি ? কালীপ্রসন্নের নামে প্রচারিত প্রায় সব রচনাই লেখকত্বের দাবিতে বিতর্কিত। তাঁর প্রথম নাটক 'বাবুনাটক' আজও অনাবিষ্কৃত। 'মালতী মাধব', 'সাবিত্রী সত্যবান,' 'বিক্রমোর্বশী' এ তিনটি নাটক নিছক সংস্কৃতের অনুবাদ ; —যা বাইশ বছরের বাবু-যুবক কালীপ্রসন্নের পক্ষে সম্ভব নয়, অথচ মহাভারত-অনুবাদক বেতনভুক্‌ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা সহজেই সম্ভব। আজ জানা গেছে 'বাবুনাটক' ও 'বিধবোদ্বাহ' (যা কালীপ্রসন্নের নামে প্রচারিত ছিল)—এ দুটি নাটকই হালিশহরের উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। কালীপ্রসন্নের নামে প্রচারিত আরও অনেক রচনার লেখকত্ব নিয়ে আজ প্রশ্ন। 'সমাজরঞ্জন' নামে কোনো বই তিনি কোনো দিনই লেখেন নি। তাঁর অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষের পুত্র প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে একটি উপন্যাস লিখে প্রেসে ছাপাতে দিতে গিয়ে শোনেন ঐ একই নামে কালীপ্রসন্নের একটি উপন্যাসের দু ফর্মা নাকি ইতিমধ্যেই ছাপা হয়ে গেছে। জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের মধ্যস্থতায় প্রতাপচন্দ্র তখন তাঁর লেখা উপন্যাসের নাম পরিবর্তন করে করলেন 'বঙ্গাধীপ পরাজয়'—যা প্রকাশিত ও জনপ্রিয়। আর প্রতাপচন্দ্রের বাল্যবন্ধু সতীর্থ-সহচর কালীপ্রসন্নের 'বঙ্গেশ বিজয়' বলে কোনো উপন্যাস কোনো দিনই প্রকাশিত হয়নি।

এই হলো কালীপ্রসন্নের সাহিত্য-প্রতিভা। এই প্রতিভা কি চলতি ভাষায় লেখা প্রথম জনপ্রিয় রচনা 'নক্‌শা' লেখার যোগ্য দক্ষতার আভাষ দেয় ?

এবার দেখা যাক্‌, 'নক্‌শার' অন্যতম বিতর্কিত দাবিদার ভুবনচন্দ্রের লিখনশৈলী ও সাহিত্য প্রতিভার প্রসঙ্গ। ভুবনচন্দ্র সারা জীবন অনর্গল লিখে জীবিকা উপার্জন করেছেন—সেকথা আগেই আলোচনা করেছি। তিনি সব চেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলেন 'গুপ্তকথা' ও ঐ ধরনের সহস্র রচনায়। আর 'গুপ্তকথা' ভাবভাষা-ভঙ্গী সব দিক্‌ থেকে নক্‌শার উত্তরপুরুষ। এই নক্‌শার সঙ্গে ভুবনচন্দ্রের আত্মীয়তা মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও যতীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমাণ করে গেছেন। ভুবনচন্দ্র 'সাপ্তাহিক হুতম' প্রকাশে সেই প্রমাণকে সর্বাঙ্গীণ যুক্তিসিদ্ধ করে গেছেন।

সংযোজন ॥ উপরি-উক্ত ভাষণে বক্তব্য ছিল মহাভারত অনুবাদ করানোর মতই সাহিত্য যশোলোভী ধনী কালীপ্রসন্ন তাঁর অন্তরঙ্গ বিদূষকদের দিয়ে সমসাময়িক সমাজপতিদের আচার-ব্যবহারকে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'ও লিখিয়েছেন। এই অন্তরঙ্গ বিদূষকদের অন্যতম লেখনীসম্বল ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 'নক্‌শা' লেখক হিসাবে সুবিস্তৃত সম্ভাবনার কথা ভাষণে আলোচিত হয়েছে। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন এই অনুমান সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছিলেন। পরে এই অনুমানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কিছু যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ নিয়ে 'দেশ' সাপ্তাহিকে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি এবং তখন ভুবনচন্দ্রকে 'নক্‌শার' অন্যতম লেখক অনুমান করার জন্য কিছু বিতর্কের সৃষ্টিও হয়েছিল।

তখন আমার জানা ছিল না যে 'নক্‌শা' রচনার সুপ্রভাত থেকেই কালীপ্রসন্নের আর একজন অন্তরঙ্গ সুরসিক বিদূষক সর্বদার জন্য একাজে পুরোপুরি যুক্ত ছিলেন। ইনি হলেন নব বাঁড়ুর্য্যা—নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রলোক জ্ঞানী ও গুণী। কিন্তু জমিদার বংশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশভোগী দরিদ্র নবীনকৃষ্ণ নিছক জীবিকা সন্ধানী হিসাবে সেকালের কলকাতার ধনী সাহিত্যযশোলোভীদের সাহিত্যজগতে অনুপ্রবেশ করেন। ইংরেজী বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সী, জার্মান, সেতার, সরোদ, এসরাজ—সবদিকে ছিল তাঁর অনায়াস

গতায়াত। উপরন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুরসিক, দেশীবিদেশী প্রাচীন-আধুনিক রঙ্গ-ব্যঙ্গের বিশাল ভাণ্ডার। জীবিকার সন্ধানে প্রথম জীবন থেকেই বিভিন্ন ধনী মহলে সুরসিক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তিনি ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সভাসদ্। এর পর তিনি হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ স্নেহভাজন এবং সেই সূত্রে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় অনর্গল জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত অসুস্থ হয়ে অবসর নিলে নবীনকৃষ্ণ 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদকও নিযুক্ত হন। তিনিই বোধহয় 'তত্ত্ববোধিনী'র অনালোচিত সম্পাদক—যাঁকে ছাড়া অন্যান্য সমস্ত সম্পাদক অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বহু আলোচিতও বটে। যাইহোক, এই সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী'তে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে মহাভারত অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর কিছুপরই বিদ্যাসাগর সুবিশাল মহাভারত অনুবাদ ও প্রকাশের দায়িত্ব স্থানান্তরিত করলেন কালীপ্রসন্নের কাছে, আর নবীনকৃষ্ণও সেই সঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদনা ছেড়ে কালীপ্রসন্নের সারস্বতাশ্রমে মহাভারত অনুবাদের প্রধান 'তত্ত্বাবধায়ক' হলেন। একদিকে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা, জ্ঞানগর্ভ পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি দেশী-বিদেশী অজস্র রসিকতা ছড়িয়ে নবীনকৃষ্ণ সে সময়ে কি জনপ্রিয় হয়েছিলেন সেকথা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন। এ হেন সুরসিক পণ্ডিত নবীনকৃষ্ণ 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' রচনার শুরু থেকেই কালীপ্রসন্নের মৃত্যু পর্যন্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গী। তাই 'নক্শা' রচনায় অন্যতম লেখক হিসাবে নবীনকৃষ্ণকেও অংশ নিতে হয়েছিল। একথা নবীনকৃষ্ণের মুখেই শুনেছেন চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ও তাঁর প্রবন্ধে একথা উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গটি সুবিস্তৃত আলোচনা-সাপেক্ষ এবং পৃথক্ সম্পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের অপেক্ষা রাখে।

২১ ভাদ্র ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (ইং ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯) ডক্টর সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে ৭৬তম বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

শাম্ব

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

ইতিপূর্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিগত দুই সংখ্যায় (৫৭শ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা, পৃ. ২৫-৪৩ ; ৫৮শ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৫৭-৮০) যথাক্রমে প্রাচীন ভারতীয় সূর্যোপাসনা ও সৌর দেবতা রেবন্ত সংক্রান্ত আলোচনা সূত্রে আমি পৌরাণিক শাম্বোপাখ্যান সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছিলাম। বর্তমান সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে প্রসঙ্গটিকে সম্প্রসারিত করে পৌরাণিক যুগের ধর্মবিবর্তনে কৃষ্ণপুত্র শাম্বের ভূমিকার একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শাম্ব সংক্রান্ত যে কাহিনীটি প্রাগুক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে আলোচিত হয়েছিল তদনুসারে শাম্ব দুর্বাসা ও তাঁর পিতা কৃষ্ণ কর্তৃক অভিশপ্ত হন এবং এই শাপের ফলে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। নারদের মুখে সূর্যমহিমা শ্রবণান্তর তিনি রোগমুক্তির জন্য সূর্যের আরাধনা করেন ও সূর্যের কৃপায় তাঁর রোগমুক্তি ঘটে। সূর্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশত তিনি চন্দ্রভাগানদীতীরে এক সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন এবং এখানে পূজাকার্যনির্বাহের জন্য শাকদ্বীপ থেকে আঠারোটি মগব্রাহ্মণ পরিবার জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) নিয়ে আসেন। এই ভাবে তাঁরই মাধ্যমে শাকদ্বীপী বা মগব্রাহ্মণগোষ্ঠী সৌর পুরোহিত রূপে উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই কাহিনীর ঐতিহাসিকতা ও প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, সে-সবের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মাত্র একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গেই শাম্বের নাম জড়িত নয়। পৌরাণিক সাহিত্যে তিনি উত্থান-পতন সমন্বিত এক বিশেষ চিত্তাকর্ষক চরিত্র।

শাম্ব কৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত। তাঁর বীরত্বের ও রূপের খ্যাতি ছিল। তিনি কুরুরাজ দুর্যোধনের জামাতা। দুর্যোধন-কন্যা লক্ষণাকে তিনি স্বয়ম্বরসভা থেকে হরণ করেন ; কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করলে বলরাম কৌরবগণকে পরাজিত করে তাঁকে উদ্ধার করেন ও শেষ পর্যন্ত লক্ষণার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তা ছাড়া তিনি দৈত্য বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের কন্যা গুণবতী ও বাণরাজের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা রমাকেও বিবাহ করেন। এক ঐতিহ্য অনুসারে তিনি ভ্রাতা প্রদ্যুম্নের সঙ্গে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন ও এই সূত্রে বৃকাসুরের অনুচর দৈত্য কালনাভ তাঁর হাতে নিহত হয় এবং শিবানুচর বীরভদ্রের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। পৌরাণিক সাহিত্যে শাম্বকে লঘুস্বভাব, রূপবান নায়ক রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যদুবংশধ্বংসের কাহিনীর সঙ্গেও শাম্বের নাম জড়িত। এঁকেই স্ত্রীলোক সাজিয়ে উচ্ছৃঙ্খল সুরাপ্রমত্ত যাদব যুবকগণ এক ঋষিকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এই স্ত্রীলোকটির গর্ভে কি জন্মাবে ? উত্তরে ক্রুদ্ধ ঋষি এই নিদারুণ অভিশাপ দেন—এর গর্ভ থেকে মুষল নির্গত হবে। কালস্বরূপ এই মুষল থেকেই যদুবংশ শেষ পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়। অনুমান করতে বাধা নেই শাম্বের অসাধারণ সৌন্দর্যই তাঁর সঙ্গীসাথীদের প্রণোদিত করেছিল স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনয়ের জন্য তাঁকে নির্বাচন করতে। শাম্বের শারীরিক রূপ তাঁর জীবনে আরও দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছিল। তাঁকে দেখে তাঁর বিমাতৃগণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এই কারণে কৃষ্ণ কুপিত হয়ে তাঁকে যে অভিশাপ দেন তার ফলে শাম্বের কুষ্ঠরোগ জন্মায় এবং সূর্যারাধনা করে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। পৌরাণিক

সাহিত্যে এই কাহিনীটি বিভিন্ন স্থলে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে মনে হয় কৃষ্ণ কর্তৃক পুত্রকে অভিশাপ দেওয়ার পিছনে নারদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। কোনও সময়ে শাম্ব তাঁর প্রতিও অসম্মান প্রদর্শন করায় তিনি শাম্বের উপর মনে মনে ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং শাপ দেবার জন্য কৃষ্ণকে প্ররোচিত করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে আপন স্বভাবে কৃষ্ণের এই পুত্রটি ছিলেন খানিকটা বেপরোয়া ও উচ্ছৃংখল এবং সম্ভবত দেবদ্বিজে ভক্তিহীন।

কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ইতিহাস আনুপূর্বিক আলোচনা করলে দেখা যাবে শাম্বের স্বভাবচরিত্র যেমনই হোক, ভক্তের পূজা পেতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে সমষ্টিগত ভাবে এবং একক ভাবে তাঁর পূজা বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল। উপাস্য দেবতারূপে প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের এক শিলালেখে। মথুরার নিকটবর্তী মোরা নামক গ্রামে প্রাপ্ত এই লিপি থেকে জানা যায়, শক মহাক্ষত্রপ রজুবুলের পুত্র মহাক্ষত্রপ যোডাশের শাসনকালে তোষানাম্নী এক মহিলা এক প্রস্তরমন্দিরে বৃষ্ণিবংশীয় পঞ্চবীরের পাঁচটি প্রতিমা নির্মাণ করিয়েছিলেন। স্বর্গত মূর্তিবিদ্যাপারঙ্গম অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম বায়ুপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটি (৯৭. ১-২) উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন, উক্ত শিলালেখ কথিত বৃষ্ণিবংশীয় পঞ্চ বীরদেবতা হলেন, সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব এবং অনিরুদ্ধ :

মনুষ্যপ্রকৃতীন্ দেবান্ কীর্ত্যমানান্নিবোধত।
সংকর্ষণো, বাসুদেবঃ, প্রদ্যুম্নঃ, শাম্ব এব চ ॥
অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

লক্ষ্য করা উচিত, মোরা শিলালেখে এই বীরপঞ্চক 'ভগবান্' আখ্যা পেয়েছেন এবং দেবমন্দিরে (শৈলদেবগৃহে) তাঁদের প্রতিমা পূজার নিমিত্ত স্থাপিত হয়েছে। পৌরাণিক বিবরণটিতে এই পাঁচজন 'মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতা' বলে অভিহিত হয়েছেন। এঁরা একই বংশোদ্ভূত এবং পরস্পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। স্বর্গত অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে জৈন সাহিত্যে উল্লিখিত "বলদেবমোখ্খাঃ পঞ্চমহাবীরাঃ" বর্ণনটির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বায়ুপুরাণের বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি মনে রাখলে আমরা সম্ভবত সুনিশ্চিত হতে পারি যে, জৈন গ্রন্থকারগণও 'পঞ্চমহাবীর' আখ্যার দ্বারা উক্ত পাঁচজন উপাস্য বৃষ্ণিবীরের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। পৌরাণিক বর্ণনায় 'মনুষ্যপ্রকৃতি' বিশেষণটি গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এ-সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন : "...পুরাণকার তাঁহাদিগকে শুধু দেবতা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহারা আদিতে যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কর্মবীর মনুষ্য ছিলেন ও পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা 'মনুষ্যপ্রকৃতি' এই বিশেষণটি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষে যুগে যুগে এইরূপ ধর্ম ও কর্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহাদের আদর্শ জীবনধারা ও মহোন্নত চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তাঁহাদের সমকালীন এবং পরবর্তীকালের ভারতবাসীদিগের দ্বারা দেবতাজ্ঞানে সম্মানিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সংকর্ষণ-বাসুদেবাদি বীরগণকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল উহাই পরে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হয়" (পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা ১৯৬০, পৃ. ৬১)। অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। উল্লিখিত পঞ্চবীর আদৌ যদি বা পাঁচজন ঐতিহাসিক পুরুষ হন, সংকর্ষণ ও বাসুদেবকে বাদ দিলে অপর তিনজনের বর্ণিত চরিত্রে উত্তর কালে দেবত্বে উন্নীত হবার মত কোনও মাহাত্ম্য সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। শাম্বচরিত্রে তো নয়ই। সে ক্ষেত্রে শাম্বকে এই দলভুক্ত করবার তাৎপর্য কি ? আশ্চর্যের বিষয়, বীরদেবতারূপে সমষ্টিগত পূজার বাইরে একক ভাবে শাম্বের উপাসনাও একসময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। তাঁর মূর্তিনির্মাণের বিধিও বরাহ-মিহির তাঁর 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে (৫৮, ৪০) দিয়েছেন :

"শাম্ব হবেন গদাধারী, প্রদ্যুম্ন ধনুর্ধারী ও সুন্দররূপবিশিষ্ট ; এ'দের পত্নীদের যথাক্রমে খেটক ও নিস্ত্রিংশ (তরবারী) ধারিণীরূপে নির্মাণ করতে হবে।" সুতরাং শাম্ব কেবলমাত্র এক উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক চরিত্রই নন, উপাস্য দেবতারূপেও তাঁর এক সময়ে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

কিন্তু বীরদেবতারূপে বা এককভাবে শাম্বোপাসনার ক্রম-অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর ধারাটি উত্তরোত্তর ক্ষীণ হতে হতে শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বরাহ-মিহির প্রদত্ত প্রতিমালক্ষণের উপর নির্ভর করলে সিদ্ধান্ত করতে হয় অন্তত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত অর্চারূপে একক শাম্বোপাসনা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তার আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। বর্তমানকালেও কোথাও এর নজির নেই। পঞ্চ বীরদেবতার উপাসনাও সম্ভবত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যেই লোপ পেয়েছিল, কেননা দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে কোথাও এর সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না, বরং যুগল দেবতা সংকর্ষণ-বাসুদেব (বলরাম-কৃষ্ণ)-কে এই পর্বে উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করতে দেখা যাচ্ছে। বীরদেবতাদের সঙ্গে এই মণ্ডলীর অন্তর্গত শাম্বও অবশ্যই সমষ্টিগত পূজার আসর থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। অপর পক্ষে দেখা যায়, পাঞ্চরাত্র মতবাদের অঙ্গরূপে বিকশিত চতুর্ব্যূহবাদের মধ্যেও শাম্বের কোনও স্থান হয়নি। এই ব্যূহবাদ অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কয়েকটি ক্রমোৎপন্ন পর্বে বিভক্ত এক নিরবচ্ছিন্ন বিকাশধারা। এর আদিতে আছেন গুণাতীত পর বাসুদেব (বিষ্ণু বা পরম ব্রহ্ম) ; লক্ষ্মী হলেন তাঁর পরমাশক্তি ; এই শক্তি দুইভাগে বিভক্ত—ক্রিয়াশক্তি (যার প্রতীক সুদর্শনচক্র) ও ভূতিশক্তি ; ভূতিশক্তির দ্বারা পরমা শক্তি বা লক্ষ্মী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হন এবং ক্রিয়াশক্তি দ্বারা তিনি এই বিশ্বকে প্রাণিত ও পরিচালিত করেন। পরমা শক্তির প্রকাশের প্রথম পর্বটিতে ছয়টি গুণের উন্মেষ হয়—জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজস্। বাসুদেব (এবং তদীয় শক্তি লক্ষ্মী) সমগ্রভাবে এই ছয়টি গুণের আধার। ইনি সৃষ্টির প্রথম ব্যূহ। এ'র থেকে পরবর্তী ব্যূহগুলি ক্রমোৎপন্ন ; দ্বিতীয় ব্যূহ সংকর্ষণ তাঁর মধ্যে প্রকাশিত জ্ঞান ও বল ; পরবর্তী ব্যূহ প্রদ্যুম্ন ঐশ্বর্য ও বীর্যের আধার ; এবং চতুর্থ বা শেষ ব্যূহ অনিরুদ্ধ ধারণ করেছেন শক্তি ও 'তেজস'-এর সমষ্টি। কিন্তু বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মধ্যদিয়ে সৃষ্টিতে পর্যায়ক্রমে এই গুণগুলি বিকশিত হলেও—এগুলিকে ষড়্গুণবিশিষ্ট বাসুদেবেরই রূপভেদ বলে কল্পনা করা হয়েছে—প্রকাশ বিভিন্ন হলেও এগুলির মধ্যে মৌলিক কোনও বিভেদ স্বীকৃত হয়নি। যেটি লক্ষ্য করবার বিষয় তা হল বৈষ্ণবধর্মের এই সূক্ষ্ম দার্শনিক কল্পনার মধ্যে পূর্বোক্ত বীরদেবতাগণের একমাত্র শাম্বকে বাদ দেওয়া হয়েছে। উত্তরকালে পাঞ্চরাত্র মতবাদে এই আদি ব্যূহচতুষ্টয়ের স্থলে চতুর্বিংশতি ব্যূহ স্বীকৃত হয়েছিল। বাকী কুড়িটির নামতালিকা এই : উপেন্দ্র, হরি, অনন্ত, কেশব, নারায়ণ, ত্রিবিক্রম, জনার্দন, পদ্মনাভ, দামোদর, অচ্যুত, মাধব, গোবিন্দ, মধুসূদন, অধোক্ষজ, শ্রীধর, বিষ্ণু, বামন, হৃষীকেশ, পুরুষোত্তম ও নৃসিংহ। এই বৃহত্তর তালিকাতেও শাম্বের নামটি পাওয়া যায় না।

যে দেবতা এককালে ভাগবতধর্মে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন উত্তরকালের বৈষ্ণবসমাজ তাঁকে এতখানি অবহেলা করলেন কেন ? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে কয়েকটি অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। প্রথমত, শাম্ব জাম্ববতীর গর্ভজাত। কৃষ্ণের এই পত্নী ছিলেন অনার্যবংশীয়া। হরিবংশ (১. ৩৮. ৪১) তাঁকে বলেছেন ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা ; আবার অন্যত্র বানররাজকন্যারূপেও তাঁর উল্লেখ আছে। মনে হয় তিনি এমন কোনও অনার্যগোষ্ঠী সম্ভূতা ছিলেন যার কৌম সংস্কার ছিল ভল্লুক বা বানরোৎপত্তির, এবং সেই হেতু সে বংশের দৃষ্টিতে ভল্লুক বা বানর ছিল পবিত্র গোত্রজীব। এই অনার্যরক্ত

তাঁর ধমনীতে ছিল বলেই কি শাম্ব উত্তরকালের দৃষ্টিতে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়েছিলেন ? অতি জঘন্য নৈতিক অপরাধের জন্য কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে তিনি আরোগ্যের জন্য সূর্যোপাসনা করেন এবং এই সূর্যপূজা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিদেশী মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে নিয়ে আসেন। এই জন্যই কি রক্ষণশীল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণসমাজ তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁর নাম পূজ্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছিলেন ? সাম্প্রদায়িক শৈব হস্তক্ষেপের ফলে মহাভারতের অনুশাসনপর্বে শাম্বের জন্ম সম্পর্কে একটি কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। তদনুসারে জাম্ববতী যখন কৃষ্ণের কাছে পুত্র প্রার্থনা করেন তখন কৃষ্ণ তাঁর গর্ভে রূপগুণান্বিত পুত্রলাভের জন্য শিবের আরাধনা করেছিলেন এবং শিবানুগ্রহের ফলেই শাম্বের জন্ম। এই শিবসংস্পর্শের জন্যই কি উত্তরকালের বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায় ব্যূহতালিকা থেকে শাম্বকে সরিয়ে দিয়েছিলেন ? পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে বহু মাথা ঘামিয়েছেন ও তর্কবিতর্ক করেছেন—আজ পর্যন্ত কোনও নিশ্চিত সমাধান মেলেনি। হিন্দুধর্মের উপাস্যতালিকা থেকে শাম্বের অন্তর্ধান এখনও এক রহস্যই রয়ে গিয়েছে।

প্রথম লর্ড মিণ্টোকে লেখা বাঙ্গালা দরখাস্ত

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রী দুর্গা সহায়

মহামহীম শ্রীযুত নিলবর্ট লার্ড মিণ্টু
গবনের জানেরেল কৌসেলেতে[১]
দরখাস্ত শ্রী দৈনিধি[২] মংরাজ চৌধুরী
তালুকে রত্নগিরি[৩] স্বত্ত অধিকারী
পরগণে বারগাঁ, জেলা কটক
অতিশয় ভক্তি ভরে দেখাইতেছে
আমার বিচার কর্তা[৪]

তোমার আরজবান্দা[৫] অতিশয় মিনতি পূর্বক সাধে—এহিমতি তার কঠিন আহোয়ান তোমার হাকিমর্থ বিচারের অগ্রেতে নিবেদন করিতে যে ঐ রত্নগিরি তালুকের সদর জমা মবলগে[৬] সিক্কা[৭] ৫৪৭৬ আনা ১৫।. সন ১২১৯ অমলি[৮] সালের ঐ তালুক মযকুরের (?) সদর জমা মবলগে শিক্কা ১৭৭ আনা ১২।. বাকি ছিল।

ঐ দেনার নিমির্থে মোকা কটক জেলার একটীন কালেকটার শ্রীযুত জাজ ওয়ার্ড[৯] সাহেব আমার ও এই জেলার আর আর তালুক দীগের তালুক সকলের বাকি আদায়ের জন্য তালুক বিক্রয়ের বোর্ড রিবিনিউতে রিপট করেন এবং এই বিক্রয় রিপটের এক কেতা ইস্তাহার নামা গরিব বান্দার উপর ছাদর(?) করেন এইরূপ গোচর করিয়া জে তোমার ঐ তালুকের বাকি দেনা জদ্যাপি না সন ১৮১২ সালের ৭ নবম্ভর তারিখের পূর্ব দষ রোজ ম্যাদ মর্দ্ধে আদায় করিতে না পাবো ঐ তারিখে তোমার তালুক বিক্রয় হইবেক।[১০]

গরিব আরজবান্দা ঐ ইস্তাহার পাইবা মাত্র জেরূপে হউক মযকুরের[১১] বাকি দেনা মবলগে শিক্ক। ১৭৭ ১২।. বেবাক ২ নবম্ভর তারিখে কালেক্টার সাহেবের কাছেরীতে জমা করে এবং গরিব আরজবান্দা তাহার রসিদ রাখে আর সাহেব মউষুফ (?) আরজবান্দার নিকট হইতে সুদের জন্য একরার নামা লিখিয়া লয়েন এই মযপুলে (?) যে যদ্যাপি জেলা মযকুরের আর আর তালুকদার লোক ঐ এলাকার সুদ দেয় তবে তোমাকেও দিতে হইবেক। আমি হ ঐ রূপ লিখিয়া দিলাম, তথাচো গরিব আরজবান্দার তালুক হকমাহক[১২] ৭ নবম্ভর তারিখে বিক্রয় হয়।

এই সংবাদ পাইয়া গরিব আরজবান্দা বোর্ড রিবিনিউতে এক কেতা দরখাস্ত ওজরায়।[১৩] ঐ দরখাস্ত তাহারদীগের মোনাহে জায় গরিব আরজবান্দার উপর হুকুম হয় জে তোমার তালুকের বাকি আদায়ের রিপট বিক্রয় দিবস পজ্যন্ত বোর্ডে পেঁাছে নাই এবং তোমার উপর দাওয়া ছিল। এই হেতুতে তোমার তালুক বিক্রয় হইয়াছে।

অতএব গরিব আরজবান্দার দরখাস্ত তোমার হাকিমর্থ বিচারের কৃপায় হক্‌হজতে (?) হুকুম হয় যে কি নিমিথে একটীন কালেক্টার সাহেব গরিব আরজবান্দাকে এমত সংবাদ না দেওয়া কারণ তোমার তালুক ৭ নবম্ভর তারিখে বিক্রয় হইবেক। সেরূফ গরিব আরজবান্দার উপর হুকুম জাহের হয় যে জদ্যাপি তুমি আপন তালুকের বাকি মবলগে সিক্কা ১৭৭ আনা ১২।. বিক্রয় দিবসের পূর্ব দষ রোজ ম্যাদ মর্দ্ধে আদায় করিতে না পারো

তবে তোমার তাল‍্‌ক বোর্ড রিবিনিউতে বিক্রি হইবেক। কিন্তু গরিব আরজবান্দা ঐ বাকি দেনা মবলগে সিক্কা ১৭৭ আনা ১২।. ৭ নবম্ভর তারিখে বেবাক পরিসোদ করে এবর তাহার রসিদ রাখে।

গরিব আরজবান্দার নেহাইত দারাদ্রেন্ট[14] প্রযুক্ত ঐ শ্রীযুত একটীন সাহেব বিস্যাতি[15] ক্রমে আমার তাল‍্‌কের বাকি আদায়ের রিপট বোর্ড রিবিনিউতে না পাঠাইয়া আরজবান্দার তাল‍্‌ক বিক্রয় হয়। অতএব গরিব আরজবান্দা নেহাইত মরমাথীক হইয়া হাকিমর্থ বিচারের জন্য সরনাগতো।

জেমত হ‍্‌কুম হউক ইহার আরজ করিলাম।

১. ইন কাউন‍্‌সিল।

২. দয়ানিধি।

৩. কটক হইতে ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বিরাট বৌদ্ধ বিহার খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে।

৪. 'মাই লর্ড'।

৫. আরজমন্দ—দরখাস্তকারী।

৬. বাবদ।

৭. শাহ আলমের নামে প্রচলিত কোম্পানীর টাকা।

৮. ১২১৯ অমলি=খ্রী ১৮১১-১২। লর্ড মিন্টো ১৮০৭ হইতে ১৮১৩ শাসন করিয়াছিলেন। আমলি বৎসর অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হয়।

৯. জর্জ ওয়ার্ড কটক জেলার কালেকটার উইলিয়ম ট্রাওয়ার ছুটিতে যাওয়ায় খ্রী ১৮১২-তে অস্থায়ীভাবে কার্য করিতেছিলেন।

১০. ১৮০৯-১৮১২ তিন বছরের জন্য সেটল‍্‌মেন্ট হইয়াছিল ১৮১২-১৮১৩ এক বছরের জন্য সেটল‍্‌মেণ্ট হইয়াছিল।

১১. 'হু'—যু, 'ত্ন'—কু।

১২. সর্ব সত্ত্ব সমেত।

১৩. আপত্তি জানায়।

১৪. দূরদৃষ্ট।

১৫. বিস্মৃতি।

পরিষদ্‌-সংবাদ

অনিবার্য কারণে ১৩৭৬, ১৩৭৭ এবং ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। ৮৬তম বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতি ২৩শে শ্রাবণ ১৩৮৫ তারিখে উক্ত তিন বৎসরের জন্য একটি যুগ্মসংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, করেন। বর্তমান যুগ্মসংখ্যা উক্ত সিদ্ধান্তেরই বাস্তব প্রকাশ।

বার্ষিক বিবরণী:

রীতি অনুযায়ী বার্ষিক সম্পাদকীয় বিবরণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৭৬তম বর্ষের পত্রিকা প্রকাশিত না হওয়ায় ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ৭৫তম এবং ৭৬তম বর্ষের বাৎসরিক সম্পাদকীয় বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এবং ৭৯তম বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ৭৮তম বর্ষের বার্ষিক সম্পাদকীয় বিবরণী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অতএব বর্তমান যুগ্মসংখ্যায় কেবলমাত্র ৭৭তম বর্ষের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করা হইল।

বর্তমান যুগ্মসংখ্যায় ৭৬তম, ৭৭তম এবং ৭৮তম বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী প্রকাশিত হইল। তাহা হইতে সদস্যগণ উক্ত বৎসরগুলির সাহিত্য-পরিষৎ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সংবাদ জানিতে পারিবেন।

৭৬তম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৭৭, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের **ষট্‌সপ্ততিতম বার্ষিক অধিবেশনের** বিবরণী।

সভায় শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ করেন। শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্তের-প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের সমর্থনে তাহা পরে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় বিবরণ ও ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ পাঠ করেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের সমর্থনে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আগামী ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর নিম্নলিখিত সদস্যগণ ৭৭তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হইলেন :

সভাপতি—শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহঃ সভাপতি—সর্বশ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, যোগেশচন্দ্র বাগল, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মলকুমার বসু, পুলিনবিহারী সেন ও অনাথবন্ধু দত্ত।

সম্পাদক—শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীদেবজ্যোতি দাস ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল।

পুঁথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—শ্রীউষা সেন।

অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া যে কুড়িজন প্রার্থী সাধারণ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ঘোষণা করিলেন অন্যতম ভোট পরীক্ষক শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সর্বশ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার বিশ্বাস, লীলামোহন সিংহ রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, অমলেন্দু ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শিবদাস চক্রবর্তী, রবীন্দ্র গুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শেফালি দত্ত, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, দুলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শিবদাস চৌধুরী ও হারাধন দত্ত।

শাখাপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য।

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন—নৈহাটী শাখা। শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—মেদিনীপুর শাখা। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ—বিষ্ণুপুর শাখা। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—গোহাটী শাখা।

কলিকাতা পৌর প্রতিনিধি—শ্রীতপন গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যালের সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে মেসার্স বি. সি. কুণ্ডু অ্যাণ্ড কোং ও মেসার্স এস. চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের জন্য আয়-ব্যয় পরীক্ষক নির্বাচিত হইলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদান্তে সভার কার্য শেষ হয়।

৭৭তম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী

২০শে ফাল্গুন, ১৩৭৮ ইং ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৭তম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী।

পরিষদের সভাপতি শ্রীনির্মলকুমার বসু অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের প্রস্তাবে এবং শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির ভাষণে ডাঃ সেনগুপ্ত সকল সদস্যকে এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া গড়িয়া তুলিতে আহ্বান জানান।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বলেন বড়ই আনন্দের বিষয় যে আমাদের সভাপতি শ্রীনির্মলকুমার বসু একযোগে এশিয়াটিক সোসাইটি ও পরিষদের সভাপতি।

সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ৭৭তম বর্ষের কার্যবিবরণ পাঠ করেন। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন এই বার্ষিক কার্যবিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য শ্রীনির্মলকুমার বসুকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে রাজ্যপালকে ও রাজ্যপ্রধানকে বান্ধব সদস্য করা হউক; রামমোহনের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী, রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার ও মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর স্মৃতি উদ্‌যাপন প্রতি বৎসর করা হোক।

কালীপদবাবুর এই সকল প্রস্তাব এবং শ্রীপুলকেশ দে সরকারের চাঁদা আদায় সম্বন্ধে নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় এইগুলি পরবর্তী কার্যনির্বাহক সমিতিতে আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন।

অতঃপর সম্পাদক আয়-ব্যয় বিবরণ পাঠ করেন। শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় তা সমর্থন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে আয়-ব্যয় বিবরণ গৃহীত হয়।

সভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ৭৮তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণের নাম পাঠ করেন। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীহারাধন দত্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। সভাপতি নিম্নলিখিত কর্মাধ্যক্ষগণকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করেন।

সভাপতি : শ্রীনির্মলকুমার বসু

সহঃ সভাপতি : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

সম্পাদক : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। সহঃ সম্পাদক : শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীতারাপদ সাঁতরা — গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীশঙ্খ ঘোষ

পুঁথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীউষা সেন — পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ

৭৮তম বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির যে কুড়িজন নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের নিম্নলিখিত নামগুলি পাঠ করেন শ্রীসন্তোষকুমার বসাক।

সর্বশ্রী কুমারেশ ঘোষ, ভবতোষ দত্ত, শৈলেন্দ্র গুহরায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, পুলকেশ দে সরকার, দেবকুমার বসু, মনোমোহন ঘোষ, দিলীপকুমার বিশ্বাস, অমলেন্দু ঘোষ, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন কুমার, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য,

শিবদাস চক্রবর্তী, হারাধন দত্ত, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র গুপ্ত, দিলীপকুমার মিত্র, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, দুলালপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাখা প্রতিনিধি ঃ সর্বশ্রী অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন— নৈহাটী শাখা
লক্ষ্মীকান্ত নাগ— বিষ্ণুপুর শাখা
সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়— মেদিনীপুর শাখা

৭৮তম বর্ষের জন্য শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীমলয়কুমার দেবকে হিসাব-পরীক্ষক পদে নির্বাচনের জন্য শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন প্রস্তাব করেন। সমর্থন করেন শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য।

আজীবন সদস্যপদে শ্রীদেবজ্যোতি দাশের নাম প্রস্তাব করেন শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সমর্থন করেন শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য শেষ হয়।

৭৮তম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী

১০ই আষাঢ়, ১৩৭৯ ইং ২৪শে জুন, ১৯৭২ তারিখে অনুষ্ঠিত অষ্টসপ্ততিতম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সমবেত সদস্যগণকে স্বাগত জানাইয়া সভাপতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন।

সম্পাদক শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অনুপস্থিতিতে সহকারী-সম্পাদক শ্রীদেবজ্যোতি দাশ কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত এবং পরিষদের সভাপতি শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের বার্ষিক কার্য-বিবরণ পাঠ করেন।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য কার্য-বিবরণ অনুমোদনের প্রস্তাব করেন।

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীঅমরনাথ দে, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার মিত্র বার্ষিক বিবরণের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনান্তে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে কার্য-নির্বাহক সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক কার্য-বিবরণ অনুমোদিত হয়।

সভাপতি প্রস্তাব করেন যে ৩নং কার্য-সূচী (১৩৭৮ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়-ব্যয় বিবরণ) অদ্যকার সভায় স্থগিত রাখা হউক। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, ৪নং কার্য-সূচী (১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ) অদ্যকার সভায় স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সর্বসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরিষদের ৭৯তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ৭৯তম বর্ষের জন্য কর্মাধ্যক্ষপদে নির্বাচিত হইলেন।

সভাপতি : শ্রীনির্মলকুমার বসু

সহ-সভাপতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পুলিনবিহারী সেন, অনাথবন্ধু দত্ত, ত্রিদিবনাথ রায়, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ ভট্টাচার্য।

সম্পাদক : শ্রীমদনমোহন কুমার

সহকারী সম্পাদক : শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীদিলীপকুমার মিত্র
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীভবতোষ দত্ত
পুঁথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

৭৯তম বর্ষের জন্য কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যপদে নির্বাচন প্রার্থীদের ভোটপত্র ও নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রাদি যে বাক্সে তালাবন্ধ ও সীলমোহর করা ছিল, তাহা অদ্যকার বার্ষিক অধিবেশনের সদস্যদের সম্মুখে সহকারী সম্পাদক শ্রীদেবজ্যোতি দাশ খুলিলেন এবং যে কুড়িজন নির্বাচনপ্রার্থী অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া সভাপতি বিজ্ঞাপিত করিলেন।

সর্বশ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, দেবকুমার বসু, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কামিনীকুমার রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, অমলেন্দু ঘোষ,

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, কালীপদ ভট্টাচার্য, মনোমোহন ঘোষ, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, লীলামোহন সিংহ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন চক্রবর্তী, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, হারাধন দত্ত, সন্তোষকুমার বসাক।

নিম্নলিখিত তিনজন সদস্য পরিষদ শাখাসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য বলিয়া বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হয়—

সর্বশ্রী লক্ষ্মীকান্ত নাগ	বিষ্ণুপুর শাখা
সুধাময় মুখোপাধ্যায়	মেদিনীপুর শাখা
সদানন্দ দাস	বর্ধমান শাখা

শ্রীমনোমোহন ঘোষের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের সমর্থনক্রমে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীমলয়কুমার দেব ৭৯তম বর্ষের জন্য হিসাব-পরীক্ষক পদে নির্বাচিত হইলেন।

শ্রীমতী ভেরা নভিকোভা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া সভাপতি এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

সহকারী সম্পাদক ২১ (একুশ) জন সাধারণ সদস্যের নাম নির্বাচনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং শ্রীহারাধন দত্তের সমর্থনে ও সর্ব-সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করেন যে অদ্যকার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন ৬ই শ্রাবণ ১৩৭৯ (২২শে জুলাই, ১৯৭২) শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্যন্ত স্থগিত রহিল। ঐদিন ৩নং ও ৪নং কার্যসূচী আলোচিত হইবে।

৭৮তম বার্ষিক অধিবেশন ॥ স্থগিত কর্মসূচী আলোচনা ॥

৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ ইং ২২শে জুলাই ১৯৭২ তারিখে পরিষদের অষ্টসপ্ততিতম বার্ষিক অধিবেশনের স্থগিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ সম্পাদক পাঠ করেন।

১৩৭৮ বঙ্গাব্দের উদ্বর্তপত্রের কতকগুলি ভ্রম থাকায় তাহা সংশোধিত ও অডিটর কর্তৃক পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইয়া কার্য-নির্বাহক সমিতির সভায় অনুমোদিত হইয়াছে এবং কার্য-নির্বাহক সমিতি উক্ত সংশোধিত উদ্বর্তপত্র হিসাবাদি সাধারণ সভায় গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। উক্ত সংশোধিত উদ্বর্তপত্র ও হিসাবাদি গ্রহণ করিবার জন্য সভাপতি সদস্যগণকে অনুরোধ করেন।

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীঅমরনাথ দে, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীদিলীপকুমার মিত্র আয়-ব্যয়ের বিবরণাদি সম্বন্ধে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

আলোচনান্তে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ ও উদ্বর্তপত্র সভায় গৃহীত হয়।

১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় এর বিবরণ সম্পাদক সভায় পেশ করেন। উক্ত আয়-ব্যয়ের বিবরণ সম্বন্ধে শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী, শ্রীদিলীপকুমার মিত্র সভায় আলোচনা করেন।

আলোচনান্তে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ সভায় গৃহীত হয়।

সভাপতিকে ধন্যবাদদানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ

॥ সপ্তসপ্ততিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৭তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া এই বর্ষের কার্যবিবরণ উপস্থিত করিতেছি। সূচনায় বিগত বৎসরের পরলোকগত সাহিত্য-সাধকদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বিগত ২৮ ভাদ্র ১৩৭৮ তারিখে পরিষদের সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে পরিষদ তাহার অকৃত্রিম সুহৃদ্ হারাইয়াছে। শুধু পরিষদই নহে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে তারাশঙ্করের বিয়োগ এক মর্মান্তিক ঘটনা। তারাশঙ্কর ছিলেন যুগসন্ধির লেখক। তিনি ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু, সামন্ততন্ত্র ও নূতন যুগের ভাষ্যকার। স্বাদেশিকতার মন্ত্র তাঁহার প্রতি রচনার মধ্যেই প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের বিরাটত্ব ও মহত্ত্বকে প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ পরিষদকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার অভাব আজ বড়ই বেশি করিয়া অনুভূত হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের দুইজন সহকারী সভাপতি কবি নরেন্দ্র দেব (৫ বৈশাখ ১৩৭৮) এবং গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল (২২ পৌষ ১৩৭৮) পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের বিয়োগ ব্যথায় গভীর দুঃখ অনুভব করিতেছি। পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃদ্ হিসাবে দীর্ঘকাল তাঁহারা গভীর নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন।

পরিষদের অন্যতম সুহৃদ্ প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (তারক গঙ্গোপাধ্যায়) অকালমৃত্যুতে (২২ কার্তিক ১৩৭৭) বাংলা কথাসাহিত্যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। নারায়ণবাবুর সহিত পরিষদের সংস্রব ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। তাঁহার মৃত্যুতেও পরিষদ একজন সুহৃদকে হারাইল।

বিগত ১২ জানুআরি ১৯৭২ তারিখে বাংলার মন্দির লইয়া গবেষণা-কার্যে নিযুক্ত পরিষৎ-বন্ধু ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চনের অকাল মৃত্যু আমাদের মর্মাহত করিয়াছে। গত বৎসর পরিষদে পট-প্রদর্শনীর সময়ে তিনি যেভাবে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উক্ত প্রদর্শনীর সুষ্ঠু পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহা দীর্ঘকাল স্মরণে থাকিবে।

বাংলা দেশের কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ আলোচ্য বর্ষে পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্মরণে পরিষদ্-মন্দিরে এক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া বিশ্ববন্দিত যাদুকর পি. সি. সরকারের মৃত্যু (২১ পৌষ ১৩৭৭) এবং আততায়ির হস্তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনের মৃত্যু (১৪ই পৌষ ১৩৭৭) খুবই বেদনাদায়ক'। এই বৎসর কথাসাহিত্যিক বিধুভূষণ বসু (১৭ মাঘ ১৩৭৮) এবং কবি কৃষ্ণদয়াল বসু পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহাদের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষে পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞানী বিক্রম এ. সারাভাইয়ের অকালমৃত্যুতে কার্যনির্বাহক সমিতি গত ১ মাঘ ১৩৭৮ তারিখের অধিবেশনে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধের সময় অপ্রদীপ ইত্যাদির কারণে আলোচ্য বর্ষে হিসাব পরীক্ষার কার্যে বিলম্ব ঘটায় বাৎসরিক সভার আয়োজন করিতে যে দেরি হইয়াছে তাহার জন্য সভ্যগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আর্থিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই। তাহার ফলে পরিষদের কোষাগারে অর্থের অনটন বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ 'ভারত কোষে'র পঞ্চম খণ্ডের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য আসিতে বিলম্ব ঘটায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের উদ্বর্তপত্র আপনাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে এই বৎসরের আয়কে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিন খাতে অর্থাৎ (ক) চাঁদা আদায়, (খ) গ্রন্থবিক্রয় (ভারতকোষ বিক্রয় টা. ৬,৭১৩·০০ বাদে) ও (গ) সরকারী অর্থসাহায্য বাবদ আয় যথাক্রমে টা. ৭,২৪৬·০০, ৪,৬৪৩·৬৭ ও ৮,৯৫২·০০ মোট টা. ২০,৮৪১·৬৭ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেবল মাত্র বেতন ও ভাতা বাবদ পরিষদের ব্যয় টা. ২১,৪৭৮·১২ মাত্র; সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া এই অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। সভ্য মহাশয়গণের সক্রিয় সাহায্য এবং সরকারী অর্থসাহায্য ভিন্ন পরিষদের বর্তমান অবস্থার উন্নতি করা যাইবে না। এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য চাঁদার হার বৃদ্ধির জন্য যে সভা আহ্বান করা হয় তাহাতে সাধারণ সভ্যের চাঁদার হার মাসিক টা. ১·৫০ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু অতি অল্প ভোটের ব্যবধানে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় কার্যনির্বাহক সমিতি সম্পাদকের প্রস্তাবক্রমে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হইতে বিরত থাকেন। সভ্যগণের নিকট অনুরোধ যে, তাঁহারা দয়া করিয়া এ বিষয়ে পুনরায় যেন বিবেচনা করেন। কারণ এইরূপ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বর্তমান হারের মাসিক চাঁদায় চালাইবার চেষ্টা একান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদের যে ৫ জন কর্মীর অর্ধেক বেতন দিয়া আসিতেছিলেন, এ বৎসর হইতে তাঁহাদের পুরা বেতনের অর্থ অনুদান হিসাবে পরিষদকে সাহায্য করিতে রাজি হইয়াছেন।

কার্যনির্বাহক সমিতি ॥

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির চারিটি সাধারণ অধিবেশন ও একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। (৭৭তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট 'ক'-এ উল্লেখিত হইল।)

সদস্য ॥

বিভিন্নশ্রেণীর সদস্যগণের বিবরণ পরিশিষ্ট খ'-এ প্রদত্ত হইল।

সভাসমিতি ॥

আনন্দের সহিত জানাইতেছি, বর্তমান বৎসরে বহু সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্মৃতিসভা ৭টি, বিশেষ সভা ৪টি, মাসিক অধিবেশন ১টি এবং ঐতিহাসিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত ১৫টি বক্তৃতাসভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ইহাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিসভা (১ মাঘ ১৩৭৭)

সভাপতি : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য প্রমুখ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মৃতিসভা (১৫ ফাল্গুন ১৩৭৭)

সভাপতি : শ্রীযোগানন্দ দাস

বক্তা : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ

কবিতাপাঠ : শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক (শ্রীকালিদাস রায়-রচিত), শ্রীঅজিতকুমার সমাজপতি।

নরেন্দ্র দেব স্মৃতিসভা (১৮ বৈশাখ ১৩৭৮)

সভাপতি : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত।

বক্তা : শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কবিতাপাঠ : শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

বিশেষ সাধারণ সভা (২৪ বৈশাখ ১৩৭৮)

বিষয় : সাধারণ সদস্যচাঁদা বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনা।

প্রথম মাসিক অধিবেশন (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮)

সভাপতি : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচ্য বিষয় : ভোট-পরীক্ষক নির্বাচন

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও প্রথম বক্তৃতা (৪ আষাঢ় ১৩৭৮)

সভাপতি : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্বোধক : শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

বক্তা : শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : দ্বিতীয় বক্তৃতা (৫ আষাঢ় ১৩৭৮)

বিষয় : ভারতের জাতীয়তাবাদে স্বদেশীযুগের অবদান

সভাপতি : শ্রীঅশোক সেন

বক্তা : শ্রীসুমিত সরকার

বঙ্কিম স্মরণ-সভা (১৫ আষাঢ় ১৩৭৮)

সভাপতি : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

বক্তা : শ্রীভবতোষ দত্ত

বঙ্কিম-রচনা পাঠ : শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : তৃতীয় বক্তৃতা (১৯ আষাঢ় ১৩৭৮)

বিষয় : ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কলিকাতা শহরের সামাজিক চরিত্র।

সভাপতি : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বক্তা : শ্রীসত্যেশ চক্রবর্তী

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : চতুর্থ বক্তৃতা (২৫ আষাঢ় ১৩৭৮)

বিষয় : বিংশ শতকে বাংলাদেশের কৃষি-অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব।

সভাপতি : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

বক্তা : শ্রীসৌগত মুখোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : পঞ্চম বক্তৃতা (৩২ আষাঢ় ১৩৭৮)

বিষয় : উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সভাপতি : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বক্তা : শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়

বিশেষ বক্তৃতা (৩ শ্রাবণ ১৩৭৮)

বিষয় : Identity Crisis, the quest for community and the Brahmo's Universalism : Keshab Chandra Sen as a young man.

সভাপতি : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

বক্তা : ডেভিড কফ

বিশেষ বক্তৃতা (৭ শ্রাবণ ১৩৭৮)

বিষয় : নৌকাযোগে (কনোজি অংরে) আন্দামান যাত্রা।

সভাপতি : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

বক্তা : শ্রীপিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : ষষ্ঠ বক্তৃতা (৮ শ্রাবণ ১৩৭৮)

বিষয় : অষ্টাদশ শতকে সুরাটের বাণিজ্য-পদ্ধতি

সভাপতি : শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার

বক্তা : শ্রীঅশীন দাশগুপ্ত

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : সপ্তম বক্তৃতা (১৪ শ্রাবণ ১৩৭৮)

বিষয় : অষ্টাদশ শতকে চন্দননগরে ফরাসীদের বাণিজ্য-পদ্ধতি

সভাপতি : শ্রীসব্যসাচী ভট্টাচার্য

বক্তা : শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রায়

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : অষ্টম বক্তৃতা (১৫ শ্রাবণ ১৩৭৮)

বিষয় : আধুনিক ইতিহাসচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাস

সভাপতি : শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার

বক্তা : শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : নবম বক্তৃতা (২২ শ্রাবণ ১৩৭৮)

বিষয় : অষ্টাদশ শতক ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় রাষ্ট্রপদ্ধতির স্বরূপ ও পরিণাম

সভাপতি : শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল

বক্তা : শ্রীবরুণ দে

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : দশম বক্তৃতা (২৮ শ্রাবণ ১৩৭৮)

বিষয় : অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসন ও সামরিক-পদ্ধতির স্বরূপ।

সভাপতি : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

বক্তা : শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : একাদশ বক্তৃতা (৪ ভাদ্র ১৩৭৮)

বিষয় : অষ্টাদশ শতকে শিখদিগের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সভাপতি : শ্রীনিশীথরঞ্জন রায়

বক্তা : শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : দ্বাদশ বক্তৃতা (১১ ভাদ্র ১৩৭৮)

বিষয় : অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতকে বাংলা দেশের ভাবান্দোলন

সভাপতি : শ্রীবরুণ দে

বক্তা : শ্রীঅশোক সেন

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : ত্রয়োদশ বক্তৃতা (১২ ভাদ্র ১৩৭৮)

বিষয় : ১৮৭১ হইতে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব-সমস্যা ও বাঙালী বুদ্ধিজীবিবৃন্দ

সভাপতি : শ্রীসুনীল সেন

বক্তা : শ্রীকল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : চতুর্দশ বক্তৃতা (১৮ ভাদ্র ১৩৭৮)

বিষয় : বিংশ শতকে বাংলা দেশের শিল্প-অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব

সভাপতি : শ্রীনির্মলকুমার চন্দ্র

বক্তা : শ্রীঅমিয় বাগচি

ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা : পঞ্চদশ বক্তৃতা (১৯ ভাদ্র ১৩৭৮)

বিষয় : ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালী বুদ্ধিজীবিগণের ধর্মচিন্তা ও অক্ষয়কুমার দত্ত

সভাপতি : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

বক্তা : শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য

বিশেষ বক্তৃতা (৬ কার্তিক ১৩৭৮)

বিষয় : ১৯৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে খাদ্য-পরিস্থিতি

বক্তা : শ্রীস্বদেশ বসু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভা (১৯ কার্তিক ১৩৭৮)

সভাপতি : শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীসুমথনাথ ঘোষ, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীতরুণ সান্যাল প্রমুখ

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ স্মৃতিসভা (২৬ কার্তিক ১৩৭৮)

সভাপতি : সৈয়দ আলী আহসান

বক্তা : শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত, শওকত ওসমান, শা মহম্মদ কুরেশী, স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসান মুরশেদ, মহ্ হারুন ইসলাম প্রমুখ

যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতিসভা (৬ ফাল্গুন ১৩৭৮)

সভাপতি : শ্রীনির্মল সিংহ

বক্তা : শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীসন্তোষকুমার বসাক প্রমুখ

পুস্তকপ্রকাশ

বর্তমান বর্ষে মোট ৮খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫খানি পুস্তক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত। পরিষদ-পত্রিকার ৭৫ বৎসরের লেখকসূচী প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া পরিষদ-প্রকাশিত ২খানি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পরিষদ নিজ ব্যয়ে যে পুস্তকগুলি মুদ্রণ করিতে পারিয়াছে তাহা হইল—

১. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (সা. সা. চ.—১০৬)—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

২. বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ (সা. সা. চ.—১০৭)—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

৩. গিরীন্দ্রশেখর বসু (সা. সা. চ.—১০৮)—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

৪. রামপ্রাণ গুপ্ত (সা. সা. চ.—১০৯)—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

৫. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য (সা. সা. চ.—১১০)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকসূচী : বর্ষ ১-৭৫ ॥ ১৩০১-৭৫ বঙ্গাব্দ —শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত ও বর্তমানে নিঃশেষিত ১৩ খানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে যে অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে যে ২খানি গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হইয়াছে তাহা হইল—

১. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড : প্রকাশিত হইয়াছে।

২. বিবিধ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তক দুইখানির মুদ্রণকার্য চলিতেছে এবং ভারত সরকারের অর্থের পরবর্তী কিস্তি আসিয়া পৌছাইলেই মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করা যাইবে।

৩. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড : মুদ্রণকার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

৪. বাংলা সাময়িক-পত্র, ১ম খণ্ড : মুদ্রণকার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্তমান বর্ষে শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৭৫তম খণ্ডটি প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতকোষ

ভারতকোষের ৫ম খণ্ড প্রকাশের ব্যয়নির্বাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ফর্ টেক্স্ট বুক প্রোডাকশন-সংস্থার মাধ্যমে মোট ১,১৬০০০·০০ টাকা (এক লক্ষ ষোল হাজার টাকা) মাত্র অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন। তন্মধ্যে পরিষদ ১ম কিস্তি হিসাবে ৩৫,০০০·০০ (পঁইত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন। ভারত-কোষের ৫ম খণ্ডের মুদ্রণকার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আগামী বৎসরের মধ্যেই ইহার প্রকাশনকার্য সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত

স্মারকগ্রন্থ

৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের মুদ্রণকার্যে অনিবার্য কারণ বশতঃ বিলম্ব ঘটিয়াছে। বর্তমানে মুদ্রণকার্য সরস্বতী প্রেস লিঃ-এ হওয়ায় আশা করা যাইতেছে আগামী বর্ষের মধ্যে উহার মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হইয়া যাইবে।

চিত্রশালা

এ বৎসরেও চিত্রশালা দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা যায় নাই। অর্থাভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী চালান যায় নাই—এইটিই কারণ। তত্রাচ কয়েকটি কাজ করা হইয়াছে। যেমন প্রদর্শনীয় বস্তুগুলিকে যথাযথ ভাবে সাজাইবার জন্য কয়েকটি নূতন আসবাব তৈয়ারি করা হইয়াছে; অনেকগুলি প্রতিকৃতির ফ্রেম মেরামত করিয়া সেগুলিকে যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আধুনিক পদ্ধতিতে চিত্রশালাকে সাজাইবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থের সংস্থান হইলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া চিত্রশালা দর্শকদের জন্য আগামী বৎসরে খুলিয়া দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

চিত্রশালার অন্তর্ভুক্ত জিনিসগুলির সম্পূর্ণ বর্ণনাত্মক তালিকা প্রস্তুত করিবার কাজ এ বৎসরে অনেক অগ্রসর হইয়াছে। এই কাজ শেষ হইলেই চিত্রশালায় রক্ষিত বস্তুগুলির একাংশের সংশোধিত ক্যাটালগ প্রণয়নের কাজ হাতে লওয়া হইবে। আগামী বৎসরে এই কার্যটি করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আলোচ্য বৎসরে চিত্রশালায় রক্ষিত বস্তুগুলি দেশী ও বিদেশী গবেষকরা নানা ভাবে তাঁহাদের কাজের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। ৩জন গবেষক ভাস্কর্য ও চিত্রের আলোকচিত্র লইয়াছেন এবং ১২জন গবেষক ক্যাটালগ ও মূর্তি লইয়া কাজ করিয়াছেন। দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখিয়াছেন ২২জন। ইঁহাদের মধ্যে ১৮জন প্রয়োজন অনুসারে দলিল বা অন্যান্য কাগজপত্রের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

পুথিশালা

পরিষদের পুথিশালায় আলোচ্য বর্ষে ১২খানি সংস্কৃত পুথি সংযোজিত হইয়াছে। এই বৎসরে মোট ৯৭খানি পুথি পাঠক-পাঠিকা ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থশালা

পরিষদের অন্যতম সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীসন্তোষকুমার বসাক দীর্ঘকাল তাঁহার পদে দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া বিগত ৯ বৈশাখ ১৩৭৭ তারিখ হইতে পরিষদের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কর্ম গ্রহণ করেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থশালার কার্য যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এই বৎসর গ্রন্থশালা মোট ২৬৯ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৯,২৪০ জন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৫ জন) পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে লেন-দেন বিভাগে ২৫৮ দিন কাজ হয় এবং ৪,৮৯০ জন (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৮.৯ জন) পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন এবং পাঠকক্ষে ২৬৯ দিন কাজ হয় এবং ৪৩৫৭ জন পাঠক-পাঠিকা পাঠকক্ষ ব্যবহার করেন

(অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ১৬'১ জন) উপস্থিত ছিলেন। গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর পাঠক সংখ্যা গড়ে দৈনিক ৩'৭ হারে বর্ধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দৈনিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ২৫ জন। ইহা ব্যতীত এ বৎসর সদস্য নহেন এমন ৫৬ জন ভারতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ও তাঁহারা মোট ১৩৮ খানি পুস্তক ব্যবহার করিয়াছেন।

এই বৎসর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৭,৮৫৯ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৬৭'৬ খানি) পুস্তকের আদান-প্রদান হইয়াছে। ইহার মধ্যে লেনদেন-পত্রকের সাহায্যে ৭,১৯০ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৭'৮ খানি) ও পাঠকক্ষে ১০,৬৬৯ খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৯'৬ খানি) পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। (বিষয়ানুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 'গ'-এ দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থশালার পুস্তক-সংরক্ষণ ব্যবস্থাও আলোচ্যবর্ষে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে। ধূপণ-প্রকোষ্ঠে (Fumigation chamber) এ বৎসর ৯১৭ খানি পুস্তক পরিশোধিত হইয়াছে, উইপোকার উপদ্রব দূরীকরণ-ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পাঠকক্ষের আসনবৃদ্ধির আশু প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত অবিরত ব্যবহারে গ্রন্থশালায় জীর্ণ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বহু প্রাচীন ও জীর্ণ পুথি ও পত্র-পত্রিকার মাইক্রোফিল্ম করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অর্থাভাববশতঃ বাঁধাই ও সংরক্ষণের কার্য প্রয়োজনানুসারে অগ্রসর হইতেছে না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ ও চিত্রশালার উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট এককালীন ও নিয়মিত অনুদানের জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যথারীতি ২২৯'৩০ টাকার পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে ও উপহারস্বরূপ টা. ১,৭৫৪'২৩ মূল্যের ৫৪৬ খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা উপহার দানে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইহা ব্যতীত এ বৎসর গ্রন্থাধার হিসাবে সরকারী বদান্যতায় দুইটি কাঠের র‍্যাক (Rack) তৈয়ারি করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীবিমলচন্দ্র বসু মহাশয় ৺হিরণ্ময়ী গুহ, ৺সুবর্ণবালা বসু ও ৺কুলচন্দ্র বসুঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাতে গ্রন্থাগারে ৬টি সুদৃশ্য আলমারি দান করিয়াছেন। তাঁহার এই বদান্যতার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রীমতী সান্ড্রা রবিন্‌সন্ পরিষদ্-গ্রন্থাগারে একটি বই রাখিবার সুন্দর বুক-কেস দান করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের একমাত্র কর্মী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের অন্যান্য কর্মে ব্যাপৃত থাকায় এই বিভাগের কাজের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তুলনামূলক ভাবে গ্রন্থপঞ্জী বিভাগের কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক বলা চলে। পঞ্জীকৃত (Indexed) পুস্তক-তালিকা পরিশিষ্ট 'খ'-এ দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষের বিশেষ অনুষ্ঠান

ঐতিহাসিক বক্তৃতা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদে গত ৪ আষাঢ় হইতে ১৯ ভাদ্র পর্যন্ত তিনমাস-ব্যাপী একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতামালার আয়োজন করা হইয়াছিল। সাম্প্রতিককালে যে সব বিষয় লইয়া যে পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক গবেষণা চলিতেছে তাহার সহিত আগ্রহী জনসাধারণের পরিচয় ঘটাইবার উদ্দেশ্য লইয়া এই বক্তৃতামালার আয়োজন করা হইয়াছিল। সর্বমোট ১৮ জন নবীন ও প্রবীণ ঐতিহাসিক এই বক্তৃতামালায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতামালার বিষয় ছিল অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতকের সাধারণভাবে ভারতবর্ষের এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস। প্রত্যেক বক্তাই তাঁহার সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয়বস্তু লইয়া বক্তৃতা করেন। ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা কলিকাতার বুদ্ধিজীবী-মহলে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করিয়াছিল। প্রতিদিন বক্তৃতার শেষে দীর্ঘ বিতর্ক এই বক্তৃতামালার আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছিল। বস্তুতঃ এতজন ঐতিহাসিকের একত্র সমাবেশে এরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া উন্নত ঐতিহাসিক আলোচনা কলিকাতায় ইতিপূর্বে আর হয় নাই। বর্ষা সত্ত্বেও সমাগত শ্রোতাদের গড় সংখ্যা ছিল ৪০। এই সংখ্যা হইতেই বক্তৃতামালা সম্পর্কে আগ্রহের পরিমাণ অনুমান করা যাইবে।

প্রত্যেক বক্তাই তাঁহাদের পাণ্ডুলিপি পরিষদে জমা দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। সবগুলিকে একত্র করিয়া একটি ঐতিহাসিক সংকলন প্রকাশ করার কথা চিন্তা করা হইতেছে। ইতিমধ্যে সাহিত্য-পরিষদের অনুমতিক্রমে প্রবন্ধগুলি ক্রমশ 'ইতিহাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

উপসংহার

সকল সদস্যের আগ্রহে এবং বর্তমান বৎসরের কার্যনির্বাহক সমিতির আনুকূল্যে পরিষদকে চতুর্থ বৎসর সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বর্তমান বৎসরে নানা অসুবিধা এবং দুর্যোগ পরিষদের কার্যে নানারূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। পরিষদ-সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু পরিষদের পক্ষে এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমার পক্ষেও একান্ত মর্মান্তিক ঘটনা। পরিষদ-পরিচালনায় তাঁহার নিকট হইতে যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা পাইয়াছি তাহা চিরকাল আমার স্মরণে থাকিবে। তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময়ে বাংলাদেশের বহু জ্ঞানী-গুণীকে পরিষদে পাইবার সুযোগ হইয়াছে। সার্বভৌম ও স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাংলাদেশের কয়েকটি অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন

সম্ভব হইয়াছে। বাংলা একাডেমিতে আমরা আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি। আশা করি যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশের সহিত আমরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিব। ভারত-পাকিস্তান বিরোধের সময়ে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পরিষদের সকল বিভাগে নিয়মিত কার্যাদি হইয়াছে। বলা বাহুল্য নিয়মিত কার্য হইলেও স্বাভাবিক ভাবে কার্য করা সম্ভব হয় নাই। এই সময়ে পরিষদের কর্মীগণের কর্তব্যনিষ্ঠা ও সহযোগিতায় পরিষদের কর্ম অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। সেজন্য তাঁহাদের বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই সকল কারণেই এই বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকার যে বিলম্ব হইয়াছে তাহার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আমি স্বীকার করিতেছি। আশাকরি এই বৎসরের জরুরী অবস্থা বিবেচনা করিয়া সভ্যগণ এই ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

আলোচ্য বৎসরে নানা সভা-সমিতি এবং আলাপ-আলোচনা নানা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : দেশ, আনন্দবাজার. যুগান্তর, অমৃত, অমৃতবাজার পত্রিকা, দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী, পরিচয়, গ্রন্থবার্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, যষ্টিমধু, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি। এই সকল পত্র-পত্রিকার পরিচালক-মণ্ডলীকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 'এক্ষণ ও 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাদ্বয় বিনামূল্যে পরিষদ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীনির্মাল্য আচার্য এবং শ্রীরঞ্জনকুমার দাস মহাশয়কে আমার ধন্যবাদ জানাই।

পরিষদ-সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে কার্যনির্বাহক সমিতি গত ১ আশ্বিন ১৩৭৮ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয়কে সভাপতির পদে নির্বাচিত করেন। সভাপতি মহাশয়ের নিকট হইতে পরিষদ-পরিচালনার জন্য যে উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়াছি, তাহার জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পরিষদ-সদস্য শ্রীপুলকেশ দে-সরকার, শ্রীজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীতুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞ করিয়াছেন। পরিষদের কর্মীগণের সহযোগিতা ও পরিশ্রম পরিষদ-পরিচালনায় আমাকে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল এবং আয়-ব্যয় উপসমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সহায়তা করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট একান্তভাবে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। বস্তুতঃ এই কয়জন সহকর্মী ব্যতীত পরিষদের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব হইত। ইহা সত্ত্বেও পরিষদের সেবায় সম্ভবতঃ অনেক ত্রুটি হইয়াছে। এই ত্রুটির জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। আশা করি সকল সদস্যের সহযোগিতায় পরিষদের কার্য আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুযোগ পাওয়া যাইবে।

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

পরিশিষ্ট 'ক'

॥ সপ্ত সপ্ততিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণের নাম ॥

সভাপতি—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত্যু : ২৮ ভাদ্র ১৩৭৮)
শ্রীনির্মলকুমার বসু (১ আশ্বিন ১৩৭৮ হইতে)

সহকারী সভাপতি—নরেন্দ্র দেব (মৃত্যু : ৫ বৈশাখ ১৩৭৮)
যোগেশচন্দ্র বাগল (মৃত্যু : ২২ পৌষ ১৩৭৮)
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
„ নির্মলকুমার বসু (১৩৭৮ ভাদ্র পর্যন্ত)
„ পুলিনবিহারী সেন
„ অনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক—„ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সহকারী সম্পাদক—„ দেবজ্যোতি দাশ
„ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কোষাধ্যক্ষ—„ জগদীশচন্দ্র সিংহ

পত্রিকাধ্যক্ষ—„ দেবীপদ ভট্টাচার্য

চিত্রশালাধ্যক্ষ—„ হিতেশরঞ্জন সান্যাল

পুথিশালাধ্যক্ষ—„ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—„ উষা সেন

কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য—শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী, শ্রীরবীন্দু গুপ্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশেফালী দত্ত, শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীতুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীশিবদাস চৌধুরী, শ্রীহারাধন দত্ত।

॥ শাখা-পরিষদের পক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ॥

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন—নৈহাটি শাখা।

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় -মেদিনীপুর শাখা।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ—বিষ্ণুপুর শাখা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—গৌহাটি শাখা।

শ্রীতপন গঙ্গোপাধ্যায়—কলিকাতা পৌরপ্রতিনিধি।

পরিশিষ্ট 'খ'

১৩৭৭ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য

॥ বান্ধব ॥

রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব

॥ বিশিষ্ট সদস্য ॥

(১) সর্বশ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, (২) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, (৩) সত্যেন্দ্রনাথ বসু, (৪) গোপীনাথ কবিরাজ, (৫) দিলীপকুমার রায়।

॥ আজীবন সভ্য ॥

(১) সর্বশ্রী অজিত বসু, (২) অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, (৩) অনিলকুমার রায়চৌধুরী, (৪) অমিয়কুমার সেন, (৫) অরুণকুমার সেন, (৬) অশোককৃষ্ণ দত্ত, (৭) অশোককুমার সেন, (৮) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (৯) অসীম দত্ত, (১০) অনাদিমোহন ঘোষ, (১১) ইন্দ্রভূষণ বিদ, (১২) কমলকুমার গুহ, (১৩) কল্যাণী দেবী, (১৪) কানাইচন্দ্র পাল, (১৫) কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, (১৬) কেশবচন্দ্র বসু, (১৭) কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, (১৮) ক্ষীরোদ-কুমার বসু, (১৯) গিরীন্দ্রমোহন সাহা, (২০) চারুচন্দ্র হোম, (২১) জগদীশচন্দ্র সিংহ, (২২) জগন্নাথ কোলে, (২৩) জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, (২৪) নির্মলকুমার বসু, (২৫) নেমিচাঁদ পাণ্ডে, (২৬) উষা সেন, (২৭) এ. পি. সরকার, (২৮) ত্রিদিবেশ বসু, (২৯) দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, (৩০) দীনেশচন্দ্র তপাদার, (৩১) দেবকুমার বসু, (৩২) দেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, (৩৩) দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩৪) বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, (৩৫) ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, (৩৬) পুষ্পমালা দেবী, (৩৭) প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩৮) প্রশান্তকুমার সিংহ, (৩৯) ফণিভূষণ চক্রবর্তী, (৪০) বলাইচাঁদ কুণ্ডু, (৪১) বাণী সেন, (৪২) বাসন্তী চৌধুরী, (৪৩) বিধুভূষণ ঘোষ, (৪৪) বিভূভূষণ চৌধুরী, (৪৫) মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, (৪৬) মিলন মুখোপাধ্যায়, (৪৭) মুরারিমোহন মাইতি, (৪৮) রঘুবীর সিং, (৪৯) রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়, (৫০) রণজিৎকুমার দাশ, (৫১) রূপালী দেবী, (৫২) লীলামোহন সিংহরায়, (৫৩) শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫৪) শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, (৫৫) শান্তিভূষণ দত্ত, (৫৬) শিবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, (৫৭) সত্যচরণ লাহা,

(৫৮) সত্যপ্রসন্ন সেন, (৫৯) সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, (৬০) সুধাকান্ত দে, (৬১) সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬২) সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৬৩) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬৪) সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, (৬৫) হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬৬) হরিনাথ পাল, (৬৭) হরিহর শেঠ, (৬৮) হিরণকুমার বসু, (৬৯) আর্থার হিউজ, (৭০) ভূপতি চৌধুরী, (৭১) অরবিন্দ বসু, (৭২) অতীশচন্দ্র সিংহ, (৭৩) দিলীপকুমার মিত্র, (৭৪) দুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৭৫) মধুসূদন মজুমদার।

পরিশিষ্ট 'গ'

বিষয়ানুযায়ী :

	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন (১০০)	৪৫	১৪৯	১৯৪
ধর্ম (২০০)	১৮৩	৩৮৭	৫৭০
সমাজ বিজ্ঞান (৩০০)	৬৮	২৯১	৩৫৯
শিক্ষা (৩৭০)	১৫	৫২	৬৭
ভাষা (৪০০)	৫২	১২১	১৭৩
বিজ্ঞান (৫০০)	৯	২৪	৩৩
ব্যবহারিক বিজ্ঞান (৬০০)	২	২০	২২
শিল্পকলা (৭০০)	২২	৫৩	৭৫
সঙ্গীত (৭৮০)	৪৯	১৫৯	২০৮
সাহিত্য (৮০০)	৫৯০৭	৩২৪৬	৯১৫৩
ভূগোল, বর্ণনা, ভ্রমণ (৯১০)	১৩৬	৩৩	১৬৯
জীবনী (৯২০)	৪৮১	৫৫২	১০৩৩
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯)	১৫৩	৫৩১	৬৮৪
সহায়ক গ্রন্থ (Ref. Book)	৬৮	৩৯৭	৪৬৫
পত্রপত্রিকা		৪৬৫৪	৪৬৫৪
	৭,১৯০	১০,৬৬৯	১৭,৮৫৯

ভাষানুযায়ী :

	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
বাংলা	৭১০৯	৯৫৭৭	১৬৬৮৬
ইংরেজী	৭৭	১০৮৫	১১৬২
সংস্কৃত	৪	৬	১০
হিন্দী	০	১	১
	৭,১৯০	১০,৬৬৯	১৭,৮৫৯

পরিশিষ্ট 'ঘ'

সাধারণ সংগ্রহ

বাংলা	১৯,০২০
ইংরেজী	১০,৯৩৯
সংস্কৃত	১,৪৯০
হিন্দী, অসমীয়া, মারাঠী ইত্যাদি	১৬৪

সাময়িকপত্র

ইংরেজী	১,৫০১
বাংলা	২,১১২

ব্যক্তিগত সংগ্রহ

বিদ্যাসাগর	৩,২৭৩
রমেশচন্দ্র দত্ত	১,০৯৫
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১,৭৭৩
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২,২০৩
ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৯৫
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৫২৮
বিনয়কৃষ্ণ দেব	৫৭৮
যতীন্দ্রনাথ পাল	৯,৫৪৫
	৫৫,২১৬
ছাপানো তালিকা :	১৩,৫৪৭
	৬৮,৭৬৩

পরিশিষ্ট 'ঙ'

॥ বিভিন্ন সংস্থায় পরিষদের প্রতিনিধি ॥

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয়াটিক সোসাইটির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিকী
প্লেক অ্যাডভাইসরি বোর্ড—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীসরোজিনী বসু
স্বর্ণপদক কমিটি—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা প্রাইজ
স্পেশাল কমিটি—শ্রীকল্যাণী দত্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র
লেকচারশিপ কমিটি—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী
স্বর্ণপদক কমিটি— শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী দাসী
স্বর্ণপদক কমিটি—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

নৈহাটি ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও
সংগ্রহশালা ম্যানেজিং কমিটি—শ্রীমতিলাল কুণ্ডু

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃক প্রকাশিত।

নবগবাণী প্রিন্টার্স, ৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬ হইতে

শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ, কর্তৃক মুদ্রিত।